মার্কসবাদ

এম এন রায়

ভূমিকা

আমাদের দেশে মার্কসবাদ সম্বন্ধে নানারকম ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। মার্কসবাদ কী? এ জানার আগেই মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতির উপর কতকগুলি অহেতুক দোষারোপ করা হয়। সাধারণত মার্কসবাদ বলে আমাদের দেশে যা প্রচলিত আছে–তা অত্যন্ত বিকৃত এবং অস্পষ্ট। এবং মার্কসবাদ প্রচারকদের মধ্যেও অনেকের এই বৈজ্ঞানিক দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান ও ধারণা না থাকায়, তা আরও বিকৃত হয়েছে এবং সে কারণে তা সাধারণের কাছে ঘৃণ্য ও ত্যাজ্য হয়ে রয়েছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ইতিহাস ও দর্শন পর্যালোচনা করে, মার্কস ইতিহাসের এক বিশেষ ব্যাখ্যা করেন; এবং ইতিহাস ও দর্শনকে চিরপরিবর্তনশীল বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত করেন। যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে মার্কস ইতিহাসের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বিশ্লেষণ করেন–সেই দৃষ্টিভঙ্গি হলো প্রধানত অর্থনৈতিক। এবং মার্কসীয় দর্শন ও রাজনীতির মূল ও প্রধান ভিত্তি হলো অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। ইতিহাসের এই অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দ্বারা তিনি দেখান যে, মানব সমাজ পূর্বে জমিদারি বা সামন্ত প্রথার নিয়মকানুন অনুযায়ী চলতো, ক্রমশ ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা সাম্যবাদে পরিণত হবে। মোটামুটি এই হলো ইতিহাসের মার্কসীয় রূপ।

কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে যে, অর্থনৈতিক কারণই ইতিহাসের প্রধান কারণ নয়–ইতিহাস গঠন এবং সংস্কারে মনের অংশ খুব বেশি। মানুষের আচার-ব্যবহার, তার সংস্কৃতি, তার মন ও মত, তার ব্যক্তিগত সত্তাও দৈনন্দিন জীবনের উপর নির্ভর করে। এবং এই মন ও ভাব আবার সমাজে প্রতিফলিত

হয় এবং সমাজকে পুনর্গঠন করতে, সংস্কার করতে ব্যাপৃত হয়। তবে যদিও এই পরিবর্তনে মানুষের মন এবং প্রতিভার প্রভাব ও গুরুত্ব খুবই বেশি তবুও অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুনর্গঠনের দ্বারাই এক সমাজব্যবস্থা অন্য সমাজব্যবস্থার থেকে পৃথক। এবং সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক উন্নতিই হলো সভ্যতার আধার। মানুষের মননশীলতা, তার সভ্যতা, সংস্কৃতি সবই নির্ভর করে প্রধানত তার অর্থনৈতিক সচ্ছলতার উপর। কারণ সংস্কৃতি ও সভ্যতার প্রধান ভিত্তি অর্থাৎ অবসর ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নির্ভর করে। তাই যে মানুষ ও যে দেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক পিছিয়ে আছে, অনুন্নত, সেখানে সাম্য, স্বাধীনতা, সভ্যতা, সংস্কৃতির কথাই উঠতে পারে না। অনুন্নত অর্থনৈতিক অবস্থায় ব্যক্তিগত সভ্যতা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির উন্নতির নজির পাওয়া যায় কিন্তু সমষ্টিগত উন্নতির নজির পাওয়া যায় না; তাই অর্থনৈতিক দিকটা ইতিহাস ও দর্শনের একটি বিশেষ এবং প্রধান ভিত্তি।

তাছাড়া মার্কসই যে, ইতিহাস, দর্শন ও রাজনীতির শেষ কথা বলে গেছেন তা নয়। মার্কস ইতিহাসের এক বিশেষ রূপ দেখিয়ে গেছেন, সমাজ ও সভ্যতার এক বিশেষ দর্শন সৃষ্টি করে গেছেন। মার্কসবাদ কোনো বিশেষ মত নয়, তা শুধু সমাজ ও জীবনের বৈজ্ঞানিক, যুক্তিপূর্ণ, পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। আজ যদি এর পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়, মার্কসের কতকগুলি বিচার বিশ্লেষণকে বাতিল করে তার পরিবর্তে নতুন যুক্তি ও নতুন পথ অবলম্বনের প্রয়োজন হয়, তাও করতে হবে এবং তাই হলো প্রকৃত মার্কসীয় ঐতিহ্য। এই পরিবর্তনশীল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির উপরই মার্কসবাদ প্রতিষ্ঠিত। এবং এরই উপর গড়ে তুলতে হয় ভবিষ্যতের দর্শন ও আদর্শ।

ইতিহাসের মার্কসীয় বিশ্লেষণ চিরস্থায়ী স্থির নয়। মার্কসবাদ বলে যে, নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসেরও নতুনভাবে আলোচনা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হয়। এই পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গিই মার্কসবাদের বিশেষত্ব এবং তাই মার্কসবাদকে কোনো বিশেষ সমাজব্যবস্থার দর্শন বা ইতিহাস হিসেবে গণ্য করলে ভুল হবে। মার্কসবাদ কোনো বিশেষ দার্শনিক মতবাদ বা সূত্রাবলি অথবা বিশেষ রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মত বা পথ

নয়। মার্কসবাদ দর্শন ও ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক রূপ, যুক্তিবাদ হলো এর বনেদ; সময়ের সাথে সাথে তা নিজেকে পরিবর্তন করে এবং নতুন অবস্থা অনুযায়ী তার পুনর্বিচার করে। ঠিক এই সম্বন্ধে মার্কসের সহকর্মী এঙ্গেলস পল আর্নস্টকে একটি চিঠিতে লেখেন, 'মার্কস দর্শন বলে যে, প্রত্যেক অবস্থার ইতিহাসকে নতুনভাবে বিচার ও বিশ্লেষণ করতে হবে।' এই বিষয়ে কনরাড স্মিডকে ও অন্যান্য কয়েকজনকে কয়েকটি চিঠিতে এঙ্গেলস ঠিক এই পরিবর্তনশীল যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন।

মার্কসই প্রথম প্লেটোর মানববাদকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করে তোলেন। মানুষই যে সমাজের মূল এবং সমাজব্যবস্থার এবং সভ্যতার মাপকাঠি-প্লেটোর এই দার্শনিক পর্যালোচনা হলো মার্কস দর্শনের মূল ভিত্তি। তাই প্রত্যেকটি মানুষের সর্বাঙ্গীন মুক্তি ও উন্নতির এক বিরাট অস্ত্র–মার্কস দর্শন। জগতকে চিরপরিবর্তনশীল হিসেবে গণ্য করে মার্কস বলেন যে, পৃথিবীতে কিছুই চিরস্থির নয়। পরিবর্তনই বিশ্বজগতের প্রকৃতি; কিন্তু এই পরিবর্তন সাধনে মানুষেরই পুরো দায়িত্ব এবং কারুকার্যতা আছে। তাই মানুষ নিজেই যেমন সমাজকে আদিম অবস্থা থেকে আজকের এই সভ্যতার উন্নততর অবস্থায় নিয়ে এসেছে আজও মানুষই তেমনি জগতকে এবং সমাজকে এই অবস্থা থেকে আরো উন্নত ও সভ্যতর অবস্থায় নিয়ে যাবে। সে ক্ষমতা মানুষের আছে; এবং মানুষ যেমন জগতকে পরিবর্তন করতে সক্ষম–সেই সঙ্গে সে তার নিজের ভাগ্য অর্থাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে পরিবর্তন করতেও সক্ষম। এইখানেই মার্কস দর্শনের সঙ্গে অন্যান্য দর্শনের পার্থক্য। এবং তাই মার্কসবাদ মানুষের জীবনের দর্শন।

প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার দার্শনিক ভিত্তি যতদিন অটুট থাকবে, যে দর্শনের মূল হলো দেশ বা জাতি বা অন্য কোনো অলৌকিক বা অপ্রাকৃতিক সংজ্ঞা, ততদিন মানুষের মনে এ বিশ্বাস, এ সংকল্প আসবে না যে, সে নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা এবং ইচ্ছামত সে তার জীবন এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজকে পরিবর্তন করতে পারে। মার্কসবাদ মানুষকে সেই দর্শনে উৎসাহী করে, অনুপ্রেরণা দেয় যা তার জীবনের দর্শন, যার সাহায্যে সে এই পরিবর্তন আনতে পারবে। তার জন্যে প্রয়োজন প্রচলিত দর্শনের পরিবর্তে যুক্তিবাদী

এবং বৈজ্ঞনিক দর্শন প্রতিষ্ঠা করা–যা যতকিছু অপ্রাকৃতিক, কাল্পনিক সব দূর করবে। এই সব মিলিয়েই মার্কসবাদ।

মার্কসবাদ, শুধু অর্থনীতি, শুধু রাজনীতি অথবা শুধু দর্শন কিংবা ইতিহাসের বিবরণ নয়। মানুষের জীবনের এবং জগতের সব কিছু নিয়েই মার্কসবাদ–সমাজকে ক্রমাগত উন্নততর ও সভ্যতর অবস্থায় নিয়ে যাবার এক প্রধান অস্ত্র; এবং একমাত্র এইদিক দিয়েই, চিরপরিবর্তনশীল সামাজিক দর্শন হিসেবে গণ্য করলে তবে মার্কসবাদের প্রকৃত তথ্য উপলব্ধি করা যাবে।

মার্কসবাদ মানুষকে নতুন করে তার সমাজ, তার সংস্কৃতিকে গড়ে তুলতে এবং তার জন্মগত বেঁচে থাকার অধিকার ও সুখে থাকার সুযোগ পেতে সাহায্য করে এবং অনুপ্রেরণা দেয়। মানুষের উন্নতি, সভ্যতা, সংস্কৃতির একমাত্র আধার–পরিবর্তনের প্রতীক, মানুষের জীবনের এই দর্শন–মার্কসবাদ। মার্কসবাদ কোনো বিশেষ শ্রেণির স্বাধীনতা সংগ্রামের আধার নয় বা দর্শন নয়, অথবা ইতিহাসের শুধু অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা নয়, মার্কসবাদ সমগ্র মানব জীবনের দর্শন–জ্ঞান ও প্রগতির প্রতীক। যুগে যুগে মানুষকে উন্নত থেকে উন্নততর করবার জগতকে, সমাজকে সভ্যতর করার ও সাম্যের পূর্ণ বিকাশের আধার; ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক রূপ ও দর্শন, মার্কসবাদ মানুষকে মানুষ হয়ে বেঁচে থাকবার এবং পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হওয়ার জন্য অনুপ্রেরণা দেয়, প্রদর্শক হয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে মানবেন্দ্রনাথ মার্কসবাদের এবং বৈজ্ঞানিক দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত; ভারতবর্ষে তিনিই প্রথম মার্কসবাদ প্রচার করেন। তাই আজ যখন মার্কসবাদ কী, এই নিয়ে বাক-বিতণ্ডা চলছে, তখন এ সম্বন্ধে মানবেন্দ্রনাথের মতো করে জানা সব থেকে প্রয়োজন; তাই মানবেন্দ্রনাথের মার্কসবাদ সম্বন্ধীয় কয়েকটি লেখা অনুবাদ করে এই বইটি প্রকাশ করা হলো।

সমরেন রায়
৯ ডিসেম্বর ১৯৪৬

সূচিপত্র

মার্কসবাদ কী?
১

মার্কসীয় দর্শন
২২

বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি
৩৩

GRONTHO.COM

মার্কসবাদ

মার্কসবাদ বলতে সাধারণত আমরা বুঝি যে এ এক বিশেষ ধরনের রাজনীতি বা অর্থনৈতিক সূত্রাবলি। যদিও অর্থনীতি এবং রাজনীতি মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত, তবুও এগুলো শুধু মার্কসবাদের অংশবিশেষ। প্রকৃতপক্ষে মার্কসবাদ একটি দর্শন। কিন্তু তার বিশেষত্ব এই যে, তা সঙ্কীর্ণ, বদ্ধ আদর্শ বা চিন্তাধারা নয়; বা শুধু কতগুলি সূত্রের সমষ্টি নয়; মার্কস দর্শন এক বিশেষ প্রণালী। অনেকের মতে, মার্কসবাদ হচ্ছে মানব ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ ও বিবরণ। কিন্তু তাও সঠিক নয়। ইতিহাসের অর্থনৈতিক বিবরণ বলতে সাধারণত যে সঙ্কীর্ণতা বোঝায়, মার্কসবাদ ইতিহাসকে সেই সঙ্কীর্ণতা থেকে উদ্ধার করেছে। মার্কসবাদ, প্রকৃতপক্ষে, ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক বিবরণ; কিন্তু বস্তুবাদ মানে 'খাও, দাও, নৃত্য কর' এই আদর্শ নয়। অর্থনৈতিক পদ্ধতি, রাজনৈতিক আদর্শ ও কার্যসূচি এসব নিয়েই মার্কসবাদ গঠিত; কারণ, মার্কসবাদ মানবজীবনের দর্শন এবং সেই হিসেবে মানুষের জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রই মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত।

মার্কস দর্শন বস্তুতান্ত্রিক দর্শন। কিন্তু মার্কসীয় বস্তুবাদ প্রচলিত বস্তুবাদের ধারণা থেকে পৃথক। প্রথমেই একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, মার্কসবাদ প্রাজ্ঞজ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞানজনিত আদর্শ নয়, যা শুধু কার্ল মার্কসের মানসিক প্রতিভার বিকাশ নয়। মার্কসবাদের ঐতিহাসিক তাৎপর্য এবং বৈশিষ্ট্য এই যে, কার্ল মার্কসের পূর্বে তিন-চার শতাব্দীর সমগ্র মানব চিন্তাধারা ও কার্যকলাপের এ এক সমষ্টিগত বৈজ্ঞানিক বিবরণ। পঞ্চদশ ও ষষ্ঠদশ

শতাব্দীতে ইউরোপীয় সমাজ যে বিরাট বিপ্লবের মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়, সেই দার্শনিক এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবই অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করে। এই বিপ্লবেরই প্রত্যক্ষফল মানব সভ্যতার নবজাগরণ। এর পূর্ব পর্যন্ত মানুষের চিন্তা একই ধারায় বদ্ধ ছিল। তার উন্নতির সব আশাই শেষ হয়ে যায়। সেই চিন্তাধারা মানুষকে রহস্যবাদ এবং ঈশ্বরবাদে মগ্ন করে রাখে। সমাজের উন্নতির জন্য মানুষকে অন্ধবিশ্বাসের মোহ এবং ধর্মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার প্রয়োজন হয়। গ্যালিলিও ও কোপার্নিকাস প্রমুখ শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কারের ফলেই তা সম্ভব হয়।

মার্কসবাদকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে হলে দর্শনের সূত্র থেকেই শুরু করা কর্তব্য। দর্শন কী—এ বিষয়ে বহু মতভেদ আছে; এবং কোনও দুজন দার্শনিকই এ বিষয়ে একমত নন। কিন্তু আমরা যদি দর্শনের ইতিহাস অধ্যয়ন করি তা হলেই একমাত্র বুঝতে পারি যে পরিচিত সংজ্ঞা দিয়ে বিশ্বজগতের বিশ্লেষণই হচ্ছে দর্শন। প্রাচ্যের এবং পাশ্চাত্যের দর্শনমাত্রেরই ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। মানুষের স্থিতি এবং তার সামাজিক পরিবেশের অর্থ নিরূপণের প্রচেষ্টাতেই দর্শনের শুরু। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে পদার্থিক জগতের পরিবেশ এবং তন্মধ্যস্থিত কার্যকলাপের পদার্থিক সংজ্ঞা দিয়ে কোনো প্রকৃষ্ট ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, তাই আদিমকালে বিশ্বজগতের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে বাধ্য হয়।

কিন্তু মানুষ স্বভাবত প্রত্যেক ব্যাপারেই কোনো কারণ নির্ধারণ না করে ক্ষান্ত হতে পারে না। যখন মানুষ কোন ঘটনার কোনো কারণ খুঁজে পায় না তখন সে তার কোনো বিশেষ কারণ নির্ধারণ করে থাকে। মানুষ যে প্রত্যেক ঘটনারই কারণ খুঁজে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেই জন্যই ধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় তাতে করেই প্রমাণ হয় যে মানুষ যুক্তিবাদী। অন্তরে অন্তরে মানুষ তা বিশ্বাস করে না যে, শূন্য থেকে কিছুর সৃষ্টি হতে পারে। প্রত্যেক ঘটনারই কোনো না কোনো কারণ আছে এবং কোন ঘটনার কারণ না জানলে তাকে অবাস্তব অলৌকিক শক্তির বিকাশ বলা হয়। কোন ঘটনার সঠিক কারণ নির্ধারণ করার অক্ষমতাই ঐশ্বরিক অলৌকিক কারণ নির্দেশের মূল; তাতে করে এই বোঝায় যে আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের দ্বারা তা অপেক্ষা যুক্তিযুক্ত

কারণ নির্দেশ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়, তাই এটা তার একটা কারণ খুঁজে বের করার প্রচেষ্টা। এইসব অলৌকিক অবাস্তব সংজ্ঞা–যাকে আমরা ঈশ্বর বা মূল কারণ বা মূল তত্ত্ব বলে থাকি, সবই বীজগণিতের অজানা অংকের সমতুল্য। কোন অজানা সংজ্ঞাকে আমরা বিশেষ এক আখ্যা দিই এবং তারপরে সেই অজানা সংজ্ঞার প্রকৃত মূল্য নির্ধারণ করতে প্রবৃত্ত হই।

যেসব সমস্যা ভারতীয় এবং ইউরোপীয় দর্শনে দুহাজার বছর পূর্বে উত্থাপিত হয়েছিল–ইউরোপীয় সমাজ ষষ্ঠদশ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে তাদের সমাধান করতে প্রবৃত্ত হয়। আধ্যাত্মিক এবং মানসিক উৎকর্ষতার এই নতুন যুগ আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতির জন্য সম্ভব হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অলৌকিক অনুমান ত্যাগ করতে সক্ষম হয়। যেসব ঘটনার কারণ পূর্বে অলৌকিক, ঐশ্বরিক শক্তির প্রভাব বলে কল্পনা করা হতো–তার মধ্যে অনেকের সঠিক বাস্তবিক কারণ নির্ধারণ করতে পদার্থ বিজ্ঞান সাহায্য করে। এই নতুন আবিষ্কারের ফলে এক নতুন দর্শনের সৃষ্টি হয়–যার মধ্যে অতীন্দ্রিয় অনুমান এবং গূঢ় রহস্যের কোন স্থান থাকে না; বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত এই দর্শন হচ্ছে মার্কসবাদ। বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মূল কথাই এই যে কোন কিছুই বিনা যুক্তিতে বা বিনা বিচারে গ্রাহ্য করা চলে না। যদি কোন বিষয় অনুসন্ধানের জন্য সূত্রের প্রয়োজন হয় তো তাকে অনুমানের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই। মৌলিক গবেষণার দ্বারা কোন অনুমানকে প্রতিষ্ঠা করাই বৈজ্ঞানিকদের কাজ। গত ১০০০ বা ১২০০ বছর পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় যে ধর্মাত্মক প্রভাব ছিল আধুনিক যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা তা বিনষ্ট করেন।

যুক্তিবাদী দর্শন একমাত্র বিজ্ঞানের সাহায্যেই বহির্জগতের বিশদ বিবরণ দিতে সক্ষম। দর্শনকে নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা করতে গিয়ে, যেখানেই কোন বিষয়ের সমাধান বিজ্ঞানের দ্বারা সম্ভব হয়নি–সেখানেই আধুনিক দার্শনিকগণ অতীন্দ্রিয় অনুমানের সাহায্য নেন। কার্ল মার্কসের পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক দর্শন এই বিপাকে পড়েছিল। এর কারণ ছিল, পূর্বেকার অলৌকিক সংজ্ঞাগুলি অস্বীকার করে তা আবার এক নতুন অলৌকিকতার সৃষ্টি করে। তার মধ্যে বিশিষ্ট হচ্ছেন ইমানুয়েল কান্ট।

কান্টীয় দর্শন ‘সর্ববিধ্বংসী’ বলে খ্যাত। কান্ট যা কিছু পুরাতন তা সমস্ত ধ্বংস করে তার পরিবর্তে এক নতুন অলৌকিকতার সৃষ্টি করেন। কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানের অপ্রসারতাই এর একমাত্র কারণ নয়, প্রকৃত কারণ হচ্ছে জ্ঞানতত্ত্বের মৌলিক সিদ্ধান্তে কতগুলি ত্রুটি। যা কিছু অপ্রয়োজনীয় তা সমস্তই পরিত্যাগ করতে গিয়ে আধুনিক দর্শনের প্রবর্তকেরা চিন্তাশক্তি এবং মানসিক বিকাশের প্রভাবকে অত্যন্ত ন্যূনজ্ঞান করেন। এমনকি মনকে মস্তিষ্ক (Brain) হতে নিঃসৃত এক বস্তু হিসেবে অনেকে বর্ণনা করেন। এতে করে জ্ঞানতত্ত্বের প্রধান সমস্যা–মানুষের জ্ঞানবর্জন কীভাবে হয়, দার্শনিকদের সেই সমাধান করতেই সচেতন করে তোলে। এই সমস্যা একরকম সকলকেই চিন্তাগ্রস্ত করে এবং কোনো রকম বৈজ্ঞানিক উত্তর বা সমাধান না পাওয়ায়, অদ্ভুত অদ্ভুত কাল্পনিক মতের সৃষ্টি হতে থাকে।

মার্কস শুধু যে এর সমাধান করেই পুরাতন দর্শনকে ধ্বংস করেন তা নয়; মার্কস এ পর্যন্ত বলেন যে, মানুষের ভাব ও বাস্তব সত্য এবং মৌলিক সংজ্ঞা।

ফলে বাদানুবাদ গিয়ে পৌঁছায় এখানে যে, মৌলিক সত্য মন না দেহ, অর্থাৎ বস্তু না আত্মা। পূর্বতন বস্তুবাদীরা মনের অর্থাৎভাবের বাস্তবতা অস্বীকার করেন। বাস্তব বলতে যার অস্তিত্বে আছে তাই বোঝায়। মানুষেরভাবেরও যে বাহ্য অস্তিত্ব আছে বস্তুবাদীদের মধ্যে প্রথম মার্কসই তো স্বীকার করেন। মার্কস বলেন যে, একবার সৃষ্টি হওয়ার পর, মানুষের ভাব ও অন্যান্য জড়বস্তুর মতো বাস্তবে পরিণত হয়।

সমস্ত মতদ্বৈধতার মধ্যে এ এক নতুন পথ দেখায়। ভাব এবং বস্তুর মধ্যে আর কোনো বিরোধবোধ থাকে না। কোনটি প্রথম–ভাব না বস্তু, এ বিষয়ে মার্কস কোন অযৌক্তিক বা কল্পনামূলক উত্তর দেননি। তিনি মানুষের চিন্তাধারার এবংভাবের ক্রমোন্নতিকে বিশদ এবং বিস্তৃত বিচার করেন এ বিষয়ে তিনি যে সর্বপ্রথম প্রচেষ্টা করেন তা নয়। মার্কস দর্শনের অগ্রদূত হেগেলই প্রথম এই কার্যে ব্রতী হন। হেগেলই প্রথম দর্শনের একটা সুসংবদ্ধ ইতিহাস লেখেন এবং এই উপসংহারে উপনীত হন যে, দর্শনের ইতিহাসই মানব সভ্যতার ইতিহাস। হেগেল বলেন যে, ভাব চিরকালই আছে এবংভাবের আত্মানুভূতিই হলো বড় জগৎ। মার্কস প্রশ্ন তোলেন যে,ভাবের সৃষ্টি কীভাবে

হয়? প্রাচীন যুগে যখন মানুষের মন ধর্মভাবাপন্ন ছিল, তখন এ প্রশ্ন অবান্তর ছিল। কিন্তু বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগে এ প্রশ্ন অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত এবং এর উত্তরের প্রয়োজন আছে। যদি তাই সত্য হয় যে দর্শনের ইতিহাসই মানবসভ্যতার ইতিহাস, তাহলে মানব সভ্যতার ইতিহাসের অর্থাৎ সামাজিক বিবর্তনের মূল কারণ হয়ভাবের আদি কারণ। ভাব একবার সৃষ্টি হলে, মানুষের চিন্তাশক্তি এবং সভ্যতার প্রগতি সেইভাবেরই বশীভূত। কিন্তু আসল প্রশ্ন হচ্ছেভাবের সৃষ্টি কীভাবে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরই সামাজিক। বিবর্তনের মূল সূত্র বা মূল কারণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হবে।

নৃতত্ত্বের এবং প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে সমাজের সৃষ্টির ইতিহাস অনুসন্ধান করে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের জীবনধারণের উপায়ের উপরই তার চিন্তাধারা নির্ভর করে, এতে করে সমস্ত সমস্যাই খুব সরল হয়ে দাঁড়ায়। হয়ত সকল দার্শনিকই মার্কস দর্শনকে পুরোপুরি মানেন না; কিন্তু আজ কোনও খ্যাতনামা দার্শনিকই, বৈজ্ঞানিকের কথা দূরে থাক, একথা অস্বীকার করবেন না যে আমাদের ব্যবহার, আমাদের চিন্তাধারা, আমাদের বিশ্বাস সবই, আমাদের সামাজিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। এ বিষয়ে আর কোনো দ্বিমত নেই। প্রাচীন যুগের ঐতিহাসিক ঘটনার মতো এ আমাদের কষ্ট করে গবেষণা করে বের করতে হবে না; পৃথিবীর সমস্ত দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রা থেকেই আমরা তা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন মত ও সামাজিক নিয়মানুবর্তী। এই সমস্ত পার্থক্যই যে নির্ভর করে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহের প্রণালীর উপর, অভিজ্ঞতার দ্বারাই তা প্রমাণ হয়েছে। মার্কসের এই গবেষণার পর জ্ঞানবিজ্ঞানের অর্থাৎ কীভাবে জ্ঞানার্জন হয়, সৃষ্টিতত্ত্বের এই আদিম সমস্যাটির সমাধান হয়। এর দ্বারা আমরা মানব ইতিহাসের এবং সভ্যতার মূল কারণে উপনীত হই–যাতে করে ইতিহাস এবং প্রগতির প্রত্যেকটি ব্যাপার আমরা জানতে পারি। মার্কসীয় রাজনীতি বা মার্কসীয় অর্থনীতিতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করি তার নামই মার্কসীয় দর্শন। আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে সেই সব সমস্যার সমাধান করে থাকি; সেই দৃষ্টিভঙ্গি বা আদর্শই হচ্ছে মার্কসবাদের মূলতত্ত্ব–বস্তুবাদ।

এই উপসংহারে উপনীত হয়ে মার্কস দর্শনের এক নতুন সংজ্ঞা দিলেন যে জগতকে বিশ্লেষণ করাই দর্শনের কাজ নয়, জগতকে নতুন করে গড়ে তোলাই দর্শনে কাজ। এর পূর্ব পর্যন্ত দর্শন কেবলমাত্র কল্পনার আধার ছিল। মানুষ এবং পৃথিবীকে বিশ্লেষণ করাই ছিল এর কাজ, প্রচলিত সমাজ এবং পৃথিবীকে মেনে নিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করাই ছিল এর উদ্দেশ্য; কিন্তু একথা দর্শন কখনও তোলেনি যে সমাজব্যবস্থা কেন এরকম থাকবে বা কেন এ রকম হয়েছে। বস্তুজগৎ এবং তার নিয়মাদিকেই একমাত্র প্রচলিত ব্যবস্থা বলে ধরে নিয়ে দর্শন সেই ব্যবস্থাকেই বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে। কিন্তু কেন এই ব্যবস্থা প্রচলিত তার কারণ পূর্বেকার দর্শন অনুসন্ধান করতে চেষ্টা করেনি; এবং যদিও বা কখনও তার কোনো প্রচেষ্টা হয়েছে তাও অলৌকিক কল্পনাতেই পরিণত হয়; আর শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমাধানই গিয়ে দাঁড়ায় ঐশ্বরিক শক্তি অথবা ঐশ্বরিক প্রয়োজনে।

এই পুরানো ধারণা অনুযায়ী, দর্শনের সঙ্গে জীবনের কোনো সম্বন্ধ নেই; এবং মানুষের দৈনন্দিন জীবন সম্বন্ধে দার্শনিকদের কোনোরূপ চিন্তা করারও প্রয়োজন নেই। তাঁরা কেবল প্রকৃতি এবং জীবনের বৈচিত্র্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। প্রত্যেকেই কোনো না কোনো অবস্থা থেকে শুরু করেন এবং একবার কোনো বিশেষ অবস্থা থেকে শুরু হলে পরবর্তী সমস্তই যথারীতি ঘটে যায়। দার্শনিক চিন্তাধারার এই মূল প্রতিজ্ঞাটির সত্যতা সম্বন্ধে সর্বপ্রথম মার্কস সন্দেহ প্রকাশ করেন। মার্কসবাদ অনুযায়ী মানুষ জগতের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা করতে পারে তার কারণ জগতের গঠনে মানুষের পুরো দায়িত্ব এবং কারুকার্যতা আছে। আমরা যদি জগতকে নতুন করে গড়ে তুলতে সক্ষম হই, তাহলে এটা স্বতঃসিদ্ধ যে, আমাদের পূর্বে মানুষই আজকের পৃথিবীকে এইভাবে গড়ে তুলেছে। মানুষ যে নিজের সুবিধামতো এবং মনমতো জগতকে পুনর্গঠন করতে পারে এই ধারণা মানুষকে সর্বপ্রকার আধ্যাত্মিক বন্ধন থেকে মুক্ত করে এবং ধর্মাত্মক চিন্তাধারা ও অন্ধ বিশ্বাসের মোহকে সমূলে ধ্বংস করে। তত্ত্বজ্ঞানজনিত দর্শন ধর্মের গোঁড়ামী বিনষ্ট করে তার পরিবর্তে এক নতুন অদৃষ্টবাদ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত মার্কসের পূর্ববর্তী বস্তুবাদ আসলে অদৃষ্টবাদই ছিল। এই মতানুযায়ী মানুষ তার সামাজিক পরিবেশের অধীন এবং এই

পরিবেশ পরিবর্তন করায় মানুষের যদিও কোনও হাত নেই তবু সে যা করে এবং যাভাবে তা সমস্তই এই পরিবেশের উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীটা এক বিরাট কারাগার; এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার উপায় নেই এবং এই কারাগার এমন এক অদৃশ্য অপরিমিত শক্তিদ্বারা পরিচালিত যাকে পূর্বের ঈশ্বর আখ্যা দেওয়া হতো এবং এখন বলা হয় বস্তু।

প্রকৃতপক্ষে মার্কসীয় দর্শনে মানুষই ঈশ্বরের স্থান অধিকার করেছে। মার্কস যা বলেছেন তা মোটেই অযৌক্তিক নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে তিনি প্রমাণ করেন যে, মানুষের ভাব, আদর্শ, বিশ্বাস এবং ব্যবহার, তার বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সব কিছুই নির্ভর করে তার সামাজিক পরিবেশের উপর। কিন্তু তারই মধ্যে মানুষ সেই পরিবেশকে তার নিজের সুবিধামতো পরিবর্তন করতে সক্ষম। জীবনযাত্রায় সে যে কেবলমাত্র অভিনেতা এবং তার সঙ্গে সামাজিক পরিবেশের কোনও নিগূঢ় সম্বন্ধ নেই তা নয়, এই জীবনযাত্রার এবং পরিবেশের সে একটা বিশেষ অংশ। কিন্তু তার নিজের আচার ব্যবহার সবই নির্ভর করে তার পরিবেশের উপর। সুতরাং মানুষ যে শুধু তার নিজের পরিবেশ এবং সত্তাকেই পরিবর্তন করতে পারে এবং সেখানেই শুধু যে সে নিজে কর্তা তা নয়, মানুষ ইতিহাসকেও নতুন করে গড়ে তুলতে পারে এটাই মার্কসবাদের সার কথা।

ইতিহাসের বস্তুতান্ত্রিক ভাষ্যের দ্বারা মার্কস সমাজ বিবর্তনের ইতিহাস নতুন করে রচনা করেন। এতদিন পর্যন্ত ইতিহাস ছিল শুধু গল্পকথা; কতকগুলি খাপছাড়া ঘটনার সমাবেশ; ঐতিহাসিক ঘটনা হিসেবেও তাদের সত্যতা ছিল অত্যন্ত সন্দেহজনক। কেউ লিখলেন কোনও এক সময়ে কোন বিশেষ স্থানে এক যুদ্ধ হয়; রচয়িতার এবং ঘটনার সত্যতা আমাদের শুধু নিঃসন্দেহে মেনেই নিতে হতো। কিন্তু সেই যুদ্ধ যে ঠিক সেই সময় বা সেই স্থানে ঘটেছিল তার কোনও সঠিক প্রমাণ নেই। যতদিন না মার্কস ইতিহাসের এই সারতথ্য নির্ধারণ করেন ততদিন ঐতিহাসিক জ্ঞানও প্রকৃত জ্ঞান ছিল না, কেবলমাত্র একটা অন্ধবিশ্বাস ছিল। বইয়েতে কিছু লেখা থাকলেই আমরা পড়তাম এবং তা মেনে নিতাম। কিন্তু মার্কস দেখালেন যে ইতিহাসও একটা বিজ্ঞান এবং এ সম্বন্ধেও গবেষণা ও অনুসন্ধান করার প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ঘটনাও যেমন

বিনা কারণে কিছু ঘটে না, সেই রকম মানব সমাজের ইতিহাসেও বিনা কারণে কিছু ঘটে না; প্রত্যেকটি ঘটনাই পূর্ববর্তী ঘটনার উপর নির্ভর করে; হঠাৎ বিনা কারণে কিছুই ঘটে না।

মার্কসই প্রথম ইতিহাসের এই মূলতত্ত্ব নির্ধারণের সন্ধান দেন। মার্কস বলেন যে, মানুষের ভাব শুধু তার সামাজিক পরিবেশের উপরই নির্ভর করে না, তার জীবিকার্জনের উপায়ের উপরও নির্ভর করে। মানসিক সত্তা মানুষের দৈহিক অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত। যেভাবে মানুষ তার জীবসত্তাকে রক্ষা করে তারই উপর তার আর সব সত্তা নির্ভর করে। কোন বিশেষ উপায়ে জীবিকার্জন শুরু করলে, তাতেই যে চিরকাল মানুষ ব্যাপৃত থাকবে, তার কোনো কারণ নেই। মানুষ তার জীবিকা অর্জনের উপায়ও পরিবর্তন করতে পারে। কুম্ভকার চিরকালই কুম্ভকার নাও থাকতে পারে। যে শক্তির সাহায্যে আদিমকালে মানুষ হাতুড়ি তৈরি করতে শেখে, সেই শক্তির সাহায্যেই সে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র তৈরি করতে সক্ষম হয়। এই নতুন যন্ত্র উৎপাদন প্রণালীকে পরিবর্তন করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সমস্ত আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ভাবও পরিবর্তিত হয়। এইভাবে উত্তরোত্তর উন্নততর উৎপাদন প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে মানুষের, ভাব ও আদর্শ সবই উন্নত হতে থাকে। এই সব পরিবর্তনই সামাজিক বিবর্তনের এক-একটি ধাপ!

ইতিহাসের এই মৌলিক তথ্য নির্ধারণ করে মার্কস তার নিজের সময়কার সামাজিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে দেখেন যে, সেই সমাজব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক। তিনি প্রমাণ করেন যে এই ব্যবস্থায় কৃষ্টি, কলা, আচার ব্যবহার সবই নির্ভর করে ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর উপর। তিনি আরও প্রমাণ করেন যে, এর পূর্বেকার ঐতিহাসিক যুগের মানুষের সমস্ত উৎকর্ষতা, তার চিন্তাধারা এবং মানবজাতির যতকিছু আধ্যাত্মিক প্রতিভা ও অবদান সবই ছিল সামন্ত প্রথার অর্থাৎ জমিদারি প্রথার উৎপাদন প্রণালী দ্বারা নির্ধারিত। সেই ব্যবস্থা যখন নিঃশেষিত ও অকেজো হয়ে পড়ে তখনই ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন হয়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থার মধ্যেই বেড়ে উঠে সেই ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে ধনতন্ত্র এক নতুন সমাজ ও সংস্কৃতি এবং নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা করে। ধনতান্ত্রিক উৎপাদন প্রণালীর উন্নতি ও সহযোগিতার জন্য

এই পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়। পরিশেষে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এইসব পরিবর্তন ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ ঘটে আসছে এবং আজ পর্যন্ত বহুবার এইসব পরিবর্তন ঘটেছে। যদি ইতিহাস শেষ পর্যায়ে না পৌঁছে থাকে তবে ঠিক পূর্বেও যেমন মানুষ এইসব পরিবর্তন সাধন করেছে পরেও তেমনি করবে। যেমন পূর্ববর্তী কৃষ্টি, কলা, আচার-ব্যবহার ভাব ও দর্শনকে ধনতান্ত্রিক আদর্শে পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় তেমনি ধনতান্ত্রিক সমাজ এবং আদর্শের পরিবর্তে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সমাজ ও আদর্শ, নতুন উৎপাদন প্রথা, নতুন মানব সভ্যতা, কৃষ্টি ও কলা, ভাব ও আদর্শ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজন হবে।

কার্ল মার্কস বলেন যে, ইতিহাস ফরমাস দিয়ে তৈরি করা যায় না; প্রচলিত ব্যবস্থার মধ্যেই যেসব উপাদান আছে তা দিয়েই আমাদের সমাজকে নতুন করে গড়তে হবে। প্রতিষ্ঠিত সমাজের জীবাণুই নতুন সমাজ সৃষ্টি করবে। অনেকের মতে মার্কসবাদী হতে হলে একমাত্র সাম্যবাদী সমাজ ছাড়া অন্য কোন সমাজব্যবস্থার চিন্তা করার বা তার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মার্কস শুধু এই কথাই বলেছেন যে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকেই সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থার প্রয়োজন হবে এবং তাই ধনতন্ত্রের পর সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বলেছেন যে, আমাদের জ্ঞান এবং ইতিহাসের সাহায্যে আমরা যতদূর দেখতে পাই, তাতে আমরা এই জানতে পারি যে, ভবিষ্যৎ সমাজ সাম্যবাদের আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেখানেই সব শেষ হয়ে যাবে। তবে আমাদের বর্তমান জ্ঞানের সাহায্যে আমরা তার পরের ব্যবস্থা কল্পনা করতে পারি না। মার্কস একথা পরিষ্কার করে বলেন যে, ধনতন্ত্রের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে; সুতরাং যদি আমাদের দেশে ধনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে তাহলে সমাজতন্ত্র অবশ্যম্ভাবী। তবে যদি আমরা দেখি যে আমরা এখনই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারি না, কারণ যে সব উপাদান সাম্যবাদের জন্য প্রয়োজন তা নেই, তাহলে প্রকৃত মার্কসবাদী হিসেবে আমাদের সেই সব উপাদানের সৃষ্টি করতে হবে; সেই ব্যবস্থার প্রচলন করতে হবে, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য যা অবশ্য প্রয়োজনীয়। কার্ল মার্কস নিজে যখন 'সাম্যবাদের খসড়া' (Communist Manifesto) রচনা

করেন তখন যদিও তিনি জানতেন যে ধনতন্ত্রের ধ্বংসের পর সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হবে তবুও তিনি রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে সামন্তপ্রথার উচ্ছেদ এবং ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেন।

মার্কসবাদ এবং সাম্যবাদ এক এটা অত্যন্ত ভুল ধারণা। মার্কসবাদের সাহায্যেই সাম্যবাদের রূপ প্রকাশ পায়। কিন্তু মার্কসবাদ সাম্যবাদ অপেক্ষা বড়। মার্কসবাদ শুধু সাম্যবাদেরই দর্শন নয়; সমগ্র মানবসভ্যতা, সমাজ বিবর্তন, সবই মার্কসবাদের অন্তর্ভুক্ত।

আজ যদি আমরা এমন এক সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পড়ি যেখানে সমাজে সবে আদিম সাম্যবাদ থেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, সে অবস্থায় মার্কসবাদ অনুযায়ী আমাদের কর্তব্য সেই বিবর্তনকে সাহায্য করে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সাহায্য করা। কারণ একবার সেই ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা তখন সেই ব্যবস্থার মধ্যে থেকে তার পরবর্তী ব্যবস্থার বনেদ তৈরি করতে সক্ষম হবো; এবং মার্কসবাদী হিসেবে সুদূরপ্রসারিত দৃষ্টি থাকার দরুন এবং পরবর্তী ব্যবস্থা সম্বন্ধে ধারণা থাকায় সেই প্রক্রিয়াকে সরল নির্দিষ্ট ও প্রয়োজনীয় পথে সচেতনভাবে পরিচালিত করতে পারবো।

মার্কসবাদের ঠিক এই দিকটাই আমাদের দেশে অশ্রদ্ধেয়। যদি আমরা মার্কসবাদ বলতে যুক্তিবাদী, ন্যায়সঙ্গত এবং বস্তুবাদী চিন্তাধারা বুঝি, কতকগুলি স্থির সিদ্ধান্তের সমষ্টি নয়, তাহলে আমরা মার্কসবাদী হয়েও যে কোনো অবস্থাতেই বাস্তববাদীর মত কাজ করতে পারবো। কিন্তু যদি এই সব বাস্তবকে মেনে না নিই তাহলে আমরা প্রকৃত মার্কসবাদী হতে পারবো না; কারণ ভবিষ্যৎ কার্যসূচি সবই ভ্রান্ত আদর্শে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং আমরা ঠিকভাবে বিচার করতে বা পরবর্তী পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছাতে সক্ষম হব না।

মার্কসবাদ, শুধু কতকগুলি স্থির নির্দেশের সমষ্টি নয়। মার্কসবাদীকে কয়েকটি স্থির সূত্রকেই চিরন্তন সত্য বলে মেনে নিতে হয় না। মার্কসবাদ জীবনের দর্শন কিন্তু তাতে শুধু সাম্যবাদীর জীবনই বুঝায় না বুর্জোয়ার জীবনের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ আছে। মার্কসবাদ আমাদের সামনে মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাসকে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ করেছে। মার্কসবাদে বিবর্তনের শেষ

কোথাও নেই, তাই আমাদের পক্ষে মার্কস যা বলে গেছেন তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করারও প্রয়োজন নেই। মার্কসবাদীর পক্ষে আধুনিক জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ভিত্তিতে মার্কসের শিক্ষাদীক্ষা প্রভৃতি সব কিছুরই পুনরায় বিচার বিশ্লেষণ করে যদি প্রয়োজন হয় তো তা পরিবর্তন করা শুধু যুক্তিসঙ্গতই নয়, একান্ত কর্তব্য এবং তাই হচ্ছে প্রকৃত মার্কসীয় রীতি 'ক্যাপিট্যাল' রচিত হওয়ার পরই মানুষের জ্ঞান ও প্রতিভা শেষ হয়ে যায়নি। এরপর মানুষের জ্ঞান অনেক বেড়েছে এবং আজ যদি সেই জ্ঞান এবং মার্কসীয় প্রণালীর সাহায্যে আমরা বুঝি যে মার্কস দর্শনের পরিবর্তন প্রয়োজন এবং তখন যদি আমাদের সেই পরিবর্তন করার সাহস না থাকে তাহলে বুঝতে হবে আমরা প্রকৃত মার্কসবাদী নই।

আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের জীবন ও চিন্তাধারায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। এইসব পরিবর্তন এতই বৈপ্লবিক যে, বহু বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকেরও ধারণা হয়েছে যে বস্তুবাদের ভিত্তি বিনষ্ট হয়ে আবার তত্ত্বজ্ঞানজনিত গণিতবিদ ঈশ্বরের যুগ শুরু হয়েছে। কিন্তু যদি মার্কসের রচিত বস্তুবাদের যুক্তি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলি তাহলে আমরা এইসব নতুন পরমার্থবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করতে পারবো না; কারণ মার্কসের সময়ের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে আজ ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে মার্কসের সময়ে কতকগুলি অখণ্ড ক্ষুদ্র কণার সমষ্টিকে বস্তু বলে কল্পনা করা হতো, আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান সেই ধারণা বিনষ্ট করে। সুতরাং যদি আমরা মার্কসের সিদ্ধান্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করি তাহলে হয়তো আমরা গোঁড়া মার্কসবাদী হতে পারি কিন্তু মার্কসের ধারণা অনুযায়ী প্রকৃত মার্কসবাদী হতে পারবো না কারণ বৈজ্ঞানিক যুক্তি ছাড়া আমরা জড়জগতকে বিশ্লেষণ করতে পারি না। আজ মার্কসবাদীদের কর্তব্য গোঁড়া বস্তুবাদের মৌলিক সিদ্ধান্তগুলি আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞানের আলোকে পরিবর্তিত করা এবং সেই পরিবর্তনের ফলেই বস্তুবাদ সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হবে।

কয়েকটি আধুনিক বাস্তব সমস্যার জন্য মার্কসের চিরাচরিত পন্থা মেনে চলা অসম্ভব। এই মার্কসীয় পথ একশ বছর পূর্বেকার ইউরোপীয় পরিস্থিতি এবং ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার বিশ্লেষণের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতীয়

সমাজের বিশ্লেষণ মার্কসের রচনায় আমরা পাই না। তার কারণ তৎকালীন ইউরোপে ভারত সম্বন্ধে কোনো জ্ঞান ছিল না। সুতরাং একথা আমরা বলতে পারি না যে, ইউরোপীয় বিবর্তনের যে ধারা মার্কস রচনা করেছিলেন তা ভারতবর্ষেও প্রযোজ্য। এমনকি ইউরোপের বর্তমান ঘটনাগুলিও মার্কসের পন্থা অনুযায়ী ঘটছে না। নতুন নতুন অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে যা মার্কস কল্পনা করেননি এবং যা বর্তমান পরিস্থিতির উপর প্রভাব বিস্তার করেছে।

মার্কসবাদ উপলব্ধি করতে গেলে একমাত্র তৎকালীন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ভিত্তিতেই তা করা যাবে। মার্কসবাদের ভিত্তি হচ্ছে যুক্তিবাদ। ইউরোপের জাগৃতি আন্দোলন (Renaissance Movement) থেকেই মার্কসবাদের সৃষ্টি। মধ্যযুগের চিন্তাধারা বর্জন করে ইউরোপীয় সমাজ তিনশ বছর অন্ধকারে আলো খুঁজে বেড়িয়েছে; অবশেষে ইউরোপীয় সমাজ মার্কসদর্শন সৃষ্টি করে। সেই তিনশ বছরের জ্ঞানের সমষ্টি মার্কসবাদ। সূক্ষ্মভাবে বিচার করে দেখলে অবশ্য মার্কসবাদের মধ্যে খুব বেশি কিছু একটা নতুনত্ব পাব না। মার্কসের পূর্বেকার আরও অনেকের ইতিহাসের বিশ্লেষণে আমরা মার্কসবাদের পরিচয় পাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে গিবনের 'রোম সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন' (Decline and Fall of Roman Empire)। এটা মার্কসের বহু পূর্বের লেখা। ষষ্ঠদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত যে চিন্তাধারা ও শিক্ষাধারা ইউরোপে চলে আসছিল তারই শেষ পর্যায় মার্কসবাদ।

মার্কসের পূর্বে ইউরোপে দার্শনিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও রাজনৈতিক–বড় বড় বিপ্লব ঘটে। এইসব বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের পড়তে হবে–শিখতে হবে; এদের সামাজিক প্রতিফল, দার্শনিক আদর্শ এবং ভিত্তি আমাদের বুঝতে হবে। যে চিন্তাধারা এসব বিপ্লবের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি ছিল, আমাদের দেশের আমূল পরিবর্তনের জন্যও সেইসবের সৃষ্টি করতে হবে, যাতে করে বহু সংখ্যক জনসাধারণ মার্কসবাদ মেনে নেয় এবং মার্কসবাদকে বাস্তবে পরিণত করতে যত্নবান হয়। তাই আমাদের দেশে মার্কসবাদীকে এইসব বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তক হিসেবে, জাগৃতি আন্দোলনের নেতা হিসেবে কাজে নামতে হবে। যে দার্শনিক বিপ্লব,

সমাজের যেসব পরিবর্তন, মার্কসের পূর্বে সাধিত হয় এবং মার্কসবাদকে মানুষের চিন্তাধারার এক প্রয়োজনীয় রূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে তারই অগ্রদূত হতে হবে আমাদের দেশের মার্কসবাদের প্রবর্তকদের।

যাদের এতটুকু ন্যায়বোধ আছে, তাদের এবং অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকেও অতি সহজে বোঝানো যাবে যে, কীভাবে শ্রমিকরা শোষিত হচ্ছে; এবং সে জন্যেই ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের প্রয়োজন। কিন্তু যতদিন সেই যুবকবৃন্দ ধর্মাত্মক এবং আধ্যাত্মিক চিন্তাধারায় মগ্ন থাকবে ততদিন কার্যক্ষেত্রে তাদের সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না মানুষ মার্কসবাদের এই মূল দার্শনিক তত্ত্বগুলি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে, সে নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা, জগতকে সে ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারে এবং মানুষের শক্তিই জগতের শ্রেষ্ঠ শক্তি, ততক্ষণ পর্যন্ত কাউকে সাম্যবাদী তৈরি করা যাবে না। এর একমাত্র উপায় যুক্তিবাদ প্রচার করা এবং শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা প্রচলন করা। আমরা আজও বেশ কল্পনা ও তত্ত্বজ্ঞানপ্রিয়। তত্ত্বজ্ঞানের সঙ্গে মার্কসবাদ প্রচার করলে তার আসল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়। আজ আমাদের দেশে মার্কসবাদের একমাত্র মূল নীতিগুলিই প্রসার লাভ করতে পারে; এবং দর্শন হিসেবেও এটা প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে, যদিও দার্শনিক ক্ষেত্রেই এটা সর্বাপেক্ষা বেশি বাধাপ্রাপ্ত হবে। মার্কসবাদের বিরুদ্ধে এইসব দার্শনিক যুক্তি গোঁড়া মার্কসবাদ দ্বারা খণ্ডন করা যাবে না; তা করতে হবে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দিয়ে। যুক্তিবাদই পৃথিবীর অন্যান্য দেশে ধর্মের ভিত্তি প্রথম শিথিল করে, ভারতেও তার প্রয়োজন। ধর্মাত্মক ভাব পরিত্যাগ না করতে পারলে মানুষ বুদ্ধি বিবেচনার সঙ্গে জীবনের বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারবে না। এটা কিছুতেই কল্পনা করা যায় না যে, কোন লোক যে ইতিহাস, দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, সে কার্ল মার্কসের একখানা বই পড়েই মার্কসবাদী হয়ে যাবে। এটা শুধু অন্ধবিশ্বাস। শ্রমিকশ্রেণি জীবনের অভিজ্ঞতার ফলেই সাম্যবাদী হয়। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে মার্কসবাদী হওয়া অনেক বেশি কঠিন। বুদ্ধিজীবীর পক্ষে মার্কসবাদ সম্বন্ধে কোনো মত গঠন করতে হলে মার্কসবাদের মূল তত্ত্বের সাথে সবিশেষ পরিচিত হতে হবে। মার্কসবাদ সম্বন্ধে এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি আমাদের দেশে কদাচিৎ দেখা

যায়। সুতরাং মার্কসবাদ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে হলে প্রথমেই, যে দার্শনিক আন্দোলনের ফলে মার্কসবাদের সৃষ্টি হয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষা নিতে হবে। আমাদের জানতে হবে যে কেন মার্কসবাদ বিপ্লবের এবং মানবসমাজের ভবিষ্যতের দর্শন। মার্কসবাদ হলো বাস্তববাদ এবং এটা প্রত্যেকটি ঘটনা যুক্তি দ্বারা বিচার করা হয় এবং সমস্ত রকম অন্ধবিশ্বাস বর্জন করা হয়। আমরা যদি প্রকৃত মার্কসবাদী হই তাহলে মার্কস যা লিখে গেছেন তাও অক্ষরে অক্ষরে আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যে বিচার করে দেখবার সাহস থাকা আমাদের প্রয়োজন। যতদিন না মার্কসবাদের এই প্রকৃত ঐতিহ্য আমরা গ্রহণ করতে পারবো ততদিন মার্কসবাদ, সাম্যবাদ ইত্যাদি বুলি আওড়ে আমরা উপকার না করে আরো অপকারই করবো।

GRONTHO.COM

মার্কসীয় দর্শন

মার্কসীয় নীতি হেগেলীয় দ্বন্দ্ববাদ ও ফয়েরবাকের বিজ্ঞানসম্মত মনুষ্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত যুগ যুগান্তরের ধর্মাত্মক, ঐশ্বরিক ও পরমার্থিক রীতিনীতি অগ্রাহ্য করে, ফয়েরবাক মানুষকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলে স্থান দেন, এবং মানুষের মাপকাঠিতেই সবকিছুর, এমনকি সামাজিক ও ধর্মাত্মক রীতিনীতির বিচার ও বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু ফয়েরবাক মানুষকে অবাস্তবরূপে গণ্য করেন; মার্কস ও এঙ্গেলস ফয়েরবাকের সেই ধারণাকে বাতিল করে মানুষকে চিরপরবির্তনশীল সামাজিক জীব হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলি দ্বন্দ্ববাদীর বিচারের ফলে ফয়েরবাকের মনুষ্যবাদ মার্কসবাদে পরিণত হয়, রূঢ় সমালোচনার দ্বারা ফয়েরবাকের তত্ত্ব নতুনভাবে প্রতীয়মান হয় এবং পরমার্থিক তথ্যের প্রকৃত মনুষ্যভাব প্রকাশিত হয়। জীবতত্ত্বের আবিষ্কারের দ্বারা ঈশ্বরবাদের রহস্য ও ধর্মের মূল উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং আত্মার অভিব্যক্তিই যে বিশ্বাস তাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ফয়েরবাকের দর্শনের প্রধান দুর্বলতা ছিল তার মূল ভিত্তিতেই। ফয়েরবাকের মতে, মানুষের সত্তাই তার বিবেক-বুদ্ধি পরিচালনা করে এবং এই সত্তা তার নিজস্ব নিয়মাধীন; কিন্তু কী এই নিয়ম বা কীভাবে তারা চালিত হয়, এ সম্বন্ধে ফয়েরবাক কোনো উত্তর দেননি। মানুষকে দিয়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা করা হলো কিন্তু মানুষ নিজেই রইলো অজানা, অপরিবর্তনীয়, চিরস্থির।

মার্কস বলেন যে, মানুষের বিবেক তার ব্যবহারিক জীবনের উপর নির্ভর করে; কিন্তু এই ব্যবহারিক জীবন আবার সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়; এবং মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি এবং তার চিন্তাধারার বিকাশও এই পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। ‘মানুষ অবিনশ্বর,

অপরিবর্তনীয়' এই ধারণা থেকেই সম্ভবত আমরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, মানুষের চিন্তাধারা সব অবস্থাতেই এবং সব কালেই এক। চিরন্তন সত্য এবং অবিনশ্বর নৈতিক আদর্শ এই অপরিবর্তনীর ধারণার উপসংহার। মানুষের সত্তা ও বিবেক সম্বন্ধে যত কিছু দ্বৈত তা, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধের এই মতামত দ্বারা দূর হয় যে, 'নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে পরিবর্তন করার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের প্রকৃতিকেও পরিবর্তন করে' (মার্কস)।

জীবনের সংগ্রাম মানুষ ব্যক্তিগতভাবে করে না, সমষ্টিগতভাবে করে। ইতিহাসের শুরু থেকেই মানুষ সামাজিক জীব। তাই মানুষের সত্তা ও তার চিন্তাধারা সামাজিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। ইতিহাসের ব্যাপক ও বিস্তৃত চর্চা এবং অনুসন্ধানের ফলে মার্কস এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, মানুষের বিবেক তার জীবন ধারণের প্রণালীর উপর নির্ভর করে; কারণ তার অর্থোপার্জনের এবং জীবনযাত্রার ধারার উপরই, মানুষের চিন্তাধারা ও তার প্রকাশ নির্ভর করে। ধর্ম, দর্শন, কান্তবিদ্যা, আইন কানুন–সবই সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শের বিভিন্ন রূপ।

মানুষ যখনই উপলব্ধি করে যে, সামাজিক জীব হিসেবে সে নিজেই তার ভাগ্যবিধাতা তখনই সে ভুয়া পরমার্থিক নৈতিক আদর্শের বাদবিচার ও অত্যাচার থেকে নিজেকে মুক্ত করে। চিরন্তন সত্য বা ভালো মন্দর অবাস্তব ধারণা জীবনের আদর্শ নয়। জীবনের আদর্শ–পরিবর্তন, অগ্রগতি এবং উন্নততর অবস্থায় পরিবর্তিত হওয়া। এই নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি মানুষ তার স্বীয় অর্জিত সামাজিক জ্ঞানের সাহায্যে সম্পন্ন করে। মানুষের আদর্শ ও ধারণা চিরপরিবর্তনশীল। মানুষের সাংস্কৃতিক ইতিহাস সেই পরিবর্তনের প্রতিকৃতি। পুরাকালে সামাজিক পরিবর্তন কোনো নিয়মাধীন ছিল না, তাই এই ধারণা হয়েছিল যে, মানুষের জীবন এক অলৌকিক শক্তির দ্বারা পরিচালিত। বিজ্ঞানের সাহায্যে আজ মানুষ তার নিজের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবার ক্ষমতা অর্জন করেছে, আজ সামাজিক পরিবর্তন পূর্বকল্পিত পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিবর্তন করা সম্ভব। মানুষের নৈতিক আদর্শকে এভাবে গঠন করতে হবে যাতে মানুষের ভবিষ্যৎ সামাজিক সংগঠনে তা সাহায্য করে। একমাত্র সমষ্টিগত সামাজিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত আদর্শ

ও মাপকাঠিতে, সকলের পক্ষেই যা মঙ্গলজনক–তাই ধার্য এবং গ্রাহ্য হবে। সামাজিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের ধারণারও পরিবর্তন হওয়া উচিত।

চিরন্তন অপরিবর্তনীয় আদর্শ হিসেবে নীতি প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার সমর্থনের দার্শনিক ভিত্তি। সর্বসাধারণের মঙ্গলের জন্য যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন এবং এই পরিবর্তনকে সাহায্য করার জন্য নৈতিক আদর্শের যে বাস্তব ও পরিবর্তনশীল ধারণার প্রয়োজন–তা সমর্থন না করে এবং সমাজের পরিবর্তে মাত্র কয়েকজনের স্বার্থ রক্ষায় প্রবৃত্ত হয়ে, নীতি তার স্বীয় আদর্শকেই ব্যর্থ করছে।

ভালো-মন্দ, সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায় ইত্যাদির ধারণার উপরই চিরাচরিত নীতি প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এইসব আদর্শের কখনও কোনো যুক্তিযুক্ত কারণ নির্ধারন করা হয়নি বা কোন ব্যাখ্যা করা হয়নি। সামান্য আলোচনা বা বিচার করলেই এদের বৈপরীত্য এবং অযৌক্তিকতা প্রকাশ পায়। প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার পক্ষে মঙ্গলজনক এবং তার সমর্থক না হলেই, তাকে কুআখ্যা দেওয়া হয়। সর্বসাধারণের মঙ্গলার্থে যখন কোনো সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়, তখন জাগৃতিশক্তি প্রচলিত 'সু'কে অগ্রাহ্য করে, চিরচরিত শ্রদ্ধেয় আদর্শকে ধ্বংস করে। তাই বর্তমানে প্রতিষ্ঠিত সমাজে যা মন্দ, ভবিষ্যতের পক্ষে তাই ভালো। প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য, জীবনের মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে এটা সাধিত হয়।

মানুষ স্বভাবতই অশ্রান্ত। তা না হলে আজও মানুষ বর্বর-অসভ্যদের মতো বাস করতে কুণ্ঠিত হতো না। মানুষ স্বভাবত শ্রান্ত, এটা বলা অপেক্ষা, হেগেলের মতানুযায়ী এটা বলাই ঠিক হবে যে, মানুষ স্বভাবতই অশ্রান্ত। মানুষ যখনই সভ্যতার পথে অগ্রসর হয়েছে, তখনই সে প্রচলিত সমাজব্যবস্থা এবং নৈতিক আদর্শকে লঙ্ঘন করেছে। সাধারণ ভারতবাসীর আধুনিক সভ্যতার প্রতি বিদ্রূপ, এ বিষয়ে উদাহরণস্বরূপ। প্রতিষ্ঠিত, অনুন্নত সমাজের পক্ষে আধুনিক সভ্যতার আদর্শ ও চিন্তাধারা কখনও সহযোগী হতে পারে না। হিন্দু সমাজের কাছে তাই আধুনিক সমাজ ঘৃণ্য। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থা ধ্বংস হলে যারা উপকৃত হবে, তাদের কাছে আধুনিক সভ্যতা ভালো এবং কাম্য।

মানুষের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য অসহযোগিতা। দোষ, গুণ সম্বন্ধে মানুষের যে অপরিবর্তনীয় ধারণা আছে–তা বর্জন করার সঙ্গে সঙ্গে নীতি সম্বন্ধেও মানুষের ধারণায় এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসে; এবং এই নতুন বৈপ্লবিক ধারণা মানুষের মনে অবিশ্রাম সংগ্রামের প্রেরণা জাগায়। বৈপ্লবিক দর্শন হিসেবে মার্কসবাদ সেই পরিবর্তনকে সাহায্য করে, প্রেরণাকে জাগিয়ে তোলে। সভ্যতা, উন্নতি এবং মানুষের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য এই পরিবর্তনের প্রয়োজন। এই প্রয়োজনের তাগিদে ভষিষ্যতকে গড়ে তোলবার শক্তি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষা থেকেই মানুষ পায়। তাই অপরিবর্তনীয় চিরস্থির নৈতিক আদর্শের বর্জন মার্কসবাদের প্রধান লক্ষ্য। শুধু তাই নয়, এই নৈতিক আদর্শের মেরুদণ্ডে যেসব ধর্মাত্মক ও ভুয়া পরমার্থিক মতবাদ প্রচলিত আছে, বিজ্ঞানের সাহায্যে মার্কসবাদ তাদের একেবারে বিনষ্ট করে দেয়।

পাশ্চাত্যের নৈতিক আদর্শ প্রাচীন প্রকৃতিবাদ ধর্মের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। আধুনিক নীতিশাস্ত্রও কোনো বিশেষ ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। পাশ্চাত্য নৈতিক আদর্শের প্রবর্তক সক্রেটিস প্রকৃতিবাদ ধর্মের ঐশ্বরিক কল্পনায় বিশ্বাস না করার জন্য খুন হয়েছিলেন। মধ্যযুগের শেষভাগে মনুষ্যবাদ এবং যুক্তিপূর্ণ পরমার্থবাদ ধর্মের গোঁড়ামি এবং ঐশ্বরিক মোহের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। পুরাকালের এবং আধুনিক নীতিশাস্ত্রের অপরিবর্তনীয় এবং একনিষ্ট আদর্শ মূলত অন্ধবিশ্বাস। এই বিশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত এবং একেই মানুষের শ্রেষ্ঠ নৈতিক আদর্শ হিসেবে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু দার্শনিক চিন্তাধারা হিসেবে এটা অত্যন্ত ক্ষতিকর। সুতরাং পরোক্ষভাবে না হলেও অন্তরীক্ষভাবে এই চিন্তাধারার অনুমোদন অবাস্তব এবং পরমার্থিক জগতের কল্পনার উপর নির্ভর করে।

সক্রেটিস নিজে নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন করেননি। প্রকৃতপক্ষে সক্রেটিসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তাঁর প্রধান শিষ্য প্লেটো নীতিশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। এই বিশ্লেষণ সক্রেটিসের যুক্তিশাস্ত্রের উপদেশ অনুযায়ী পরমার্থিক নৈতিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। সক্রেটিসের বিধর্মী নীতির পরমার্থিক ভিত্তিই ছিল খ্রিস্টীয় ঈশ্বরবাদের দার্শনিক ভিত্তি।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে ধর্মের বাহিরে কোনো নৈতিক দর্শন বা আদর্শ

গড়ে ওঠেনি। স্মৃতি ও সংহিতাগুলি কতকটা কাছাকাছি যায়; কিন্তু এই সব শাস্ত্রে যে সব সামাজিক ও ব্যক্তিগত ব্যবহারের নিয়মাদির কথা উল্লেখ আছে, সেগুলি সবই পুরোহিত ধর্মের অনুশাসনের উপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যক্তিগত, মানসিক বা আধ্যাত্মিক উন্নতির নৈতিক অবলম্বন হিসেবে তার কোনো উপকারিতা নেই। কারণ প্রথমত, ধর্মের নিয়ম কানুনের মধ্য দিয়ে তার কোনো সম্ভবনা নেই এবং দ্বিতীয়ত এইসব নিয়মাদি মানুষের পার্থিব জীবন যাপনের ধর্মানুশাসন মাত্র।

মূলত ভূমার অনুভূতির উপরই চিরাচরিত নৈতিক দর্শন প্রতিষ্ঠিত; তারই উপর এই দর্শনের ন্যায়-অন্যায়, দোষ-গুণ, ভালো-মন্দ এইসবের ধারণা নির্ভর করে। এইসব আদর্শই মানুষের ব্যবহারিক জীবনের একমাত্র পাথেয়। যেকোন নীতিবিদকেই কি ভালো, কি মন্দ জিজ্ঞাসা করলেই সে এই উত্তর দেবে যে ঈশ্বরই ভালো-মন্দের প্রতীক। ভালো বলতে কি বুঝি, সে বিষয় জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেবে যে, ভালো-মন্দের কোনো নির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই, এটা স্বভাবজাত এবং মানসিক উপলব্ধির উপর নির্ভর করে। বস্তুত ভালো-মন্দের ধারণা আসলে অবাস্তব, অবিনশ্বর। আধুনিক নীতিশাস্ত্র প্লেটোর আদর্শ থেকে কিছুই উন্নত হয়নি। অবাস্তবতা থেকেই নৈতিক দর্শনের ভুয়া আদর্শের সৃষ্টি। সাধারণত ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ তার স্বাভাবিক অনুভূতির উপরই তার নৈতিক আদর্শ গড়ে তোলে। যদি তাই সত্য হয় তাহলে মানুষের প্রত্যেকটি কাজই নীতিসঙ্গত বলে ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নীতিশাস্ত্র কতকগুলি নিয়ম-কানুন বেঁধে দেয়, যা মানুষকে মেনে চলতে হয়। আদর্শ এবং বাস্তবের এই প্রভেদের কারণ পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নৈতিক আদর্শের প্রতি তার ন্যায়সঙ্গত স্বাভাবিক ঈপ্সাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই যদিও ভালো-মন্দের বিচার মানুষের স্বভাবজাত, তবুও ভালো-মন্দের বিচার করে মানুষ তখনই চলতে পারে যখন সে তার নিজের পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য করে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারে। তাই শেষপর্যন্ত একমাত্র সাধু-সন্ন্যাসীদের দ্বারাই এটা সম্ভব হয়, কারণ একমাত্র নির্লিপ্ত পবিত্র মনের দ্বারাই এইভাবে ভালো-মন্দের বিচার করা সম্ভব।

কান্ট যুক্তিবাদের আদর্শের নীতিকে গড়ে তোলবার বিশেষ চেষ্টা করেন।

কিন্তু তাঁর আনুমানিক স্থির সিদ্ধান্তের সঙ্গে প্লেটোর মতের মূলত কোনো প্রভেদ নেই। 'সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম' এর চিরন্তন আদর্শের উপর প্লেটোর দর্শন প্রতিষ্ঠিত, এর মধ্যে সত্যম্ এবং সুন্দরম্ পার্থিব জগতের স্থান-কাল-পাত্র জনিত সীমার অতীত ভূমা বিশেষ। কিন্তু নৈতিক স্বাধীনতা ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা এই জগতেরই ব্যাপার–অসীমের নয়। সেই জন্যই পার্থিব সংজ্ঞার প্রয়োজন এবং কান্টেয় মতানুবর্তী দার্শনিকেরা তা উপলব্ধি করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, জ্যাকবী'র (Jacobi) মতে নীতির শেষ অনুমোদন অতিমানবীয় তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। যুক্তিবাদী পরমার্থিক নৈতিক দর্শনের সার এই যে, বিশ্বাসই সবের মূল এবং এটাই দর্শনের শেষ জ্ঞান। এই মতবাদই কান্টেয় দর্শনের উপসংহার। ফলে, কতকগুলি অবাস্তব আদর্শে বিশ্বাসই নীতির মূল ভিত্তি হয়ে ওঠে। অর্থাৎ, 'পরমার্থিক নৈতিক আদর্শ' ঐশ্বরিক আদর্শেরই রূপান্তর হয়ে ওঠে।

কিন্তু যখনই চিরন্তন সত্যের এই বিরাট মিথ্যা প্রকাশ পায় তখনই নৈতিক দর্শনের সমস্ত ভিত্তি চূর্ণ হয়ে যায়। এই বৈপ্লবিক জ্ঞান আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই সম্ভব; এবং আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক মতবাদ হলো মার্কসবাদ।

নৈতিক আদর্শ চিরন্তন স্থির সত্য নয়, তা আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। একের পক্ষে যা ভালো অপরের পক্ষে তা ভালো নাও হতে পারে, হয়ত অপরের পক্ষে তা অত্যন্ত মন্দ। সময়ের সাথে সাথেও আবার এই ভালো-মন্দের ন্যায্যতা পরিবর্তিত হয়। আজ যা ভালো কাল হয়তো তা ভালো নাও থাকতে পারে। সমস্ত নৈতিক আদর্শই এই রকম আপেক্ষিক সংজ্ঞা মাত্র। বস্তুর অপেক্ষা অবাস্তব গুণের আদর আরও বেশি ভ্রমাত্মক। এই আদর্শের সঙ্গে পার্থিব জগতের কোনো সংশ্রব নেই। এইসব পরমার্থিক ও ধর্মাত্মক ভিত্তিকে শিথিল করে দিয়ে বিজ্ঞান নৈতিক আদর্শে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে।

এইসব পরমার্থিক বাদ বিচারের অত্যাচার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য মনুষ্যবাদ প্রথমে এক ব্যর্থ চেষ্টা করেছিল। ধর্ম এবং নীতির এই অত্যাচারের অবসান করতে হলে ভুয়া ঈশ্বরবাদকে বিনষ্ট করে, তার পরিবর্তে মানুষের

আচার-ব্যবহারের আদর্শ হিসেবে বাস্তবিক, মূলগত ও প্রমাণযুক্ত সত্যের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনুষ্যবাদ দ্বারা এটা সম্ভব নয়। মনুষ্যবাদ ঐশ্বরিক ক্ষমতাকে বিনষ্ট করে কিন্তু তার পরিবর্তে অতিমানুষকে প্রকৃতি অপেক্ষা উচ্চতর স্থানে প্রতিষ্ঠা করে।

ইতিহাসের প্রত্যেকটি মুহূর্তে এবং ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেকটি রূপে, মানুষের জীবন ও আদর্শ নির্ভর করে তার সাময়িক, ঐতিহাসিক, সামাজিক পরিবেশ এবং বিশেষ বিশেষ পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর। কিন্তু ঈশ্বরবাদের বাস্তবতা দূর করে তার পরিবর্তে অতিমানুষের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করলে অবস্থার কোনো প্রভেদ হয় না। 'আত্মার অমরতা ঐশ্বরিক ক্ষমতা বা পরমার্থিক নৈতিক আদর্শ অপেক্ষা মানুষের প্রকৃতির চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় এবং স্বভাবজাত সদ্‌ভাবের আদর্শ অধিকতর প্রত্যক্ষ সত্য নয়।'

যখনই মানুষ অনুভব করে যে সে এই পার্থিব জগতেরই এক অংশ তখনই সে অবাস্তবতার ধোঁয়া এবং ঈশ্বরবাদের অত্যাচার থেকে মুক্ত হতে পারে। দর্শন হিসেবে কার্যকরী হতে হলে মানুষ্যবাদকে প্রাকৃতিক, স্বাভাবিক হতে হবে, নৈতিক হলে হবে না। মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবধারা এবং অভিব্যক্তি পার্থিব জগতেরই অংশ বিশেষ, সুতরাং মানুষের স্বভাবও প্রকৃতির অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় পরিবর্তনশীল। ভ্রমাত্মক ধারণা মানুষের ভালো-মন্দ বিচারের শ্রেষ্ঠ আধার হতে পারে না। সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান থাকলেই বোঝা যায় যে, মানুষের প্রকৃতি অপরিবর্তনীয় নয়।

পার্থিব এবং সামাজিক পরিবেশের উপর, এবং স্থান ও কালের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের নৈতিক আদর্শও পরিবর্তিত হয়। মানুষ সামাজিক জীব; তাই সমাজের সমষ্টির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সে যা করে এবং যা তাকে করতে হয়, তার উপরই তার স্বভাব ও প্রকৃতি নির্ভর করে। মনুষ্যসমাজ চিরস্থির নয়; তা পরিবর্তনশীল। সমাজের অস্তিত্বের উপায় ও নির্বন্ধ এবং সমষ্টিগত মঙ্গলের আধার, মানুষের নৈতিক আদর্শকেও পরিবর্তিত করে। সমাজের বাহিরে মানুষের ব্যক্তিগত কোনো সত্তা নেই। সমষ্টিগতভাবেই সে তার সত্তা অনুভব করে, যদিও সমাজ ব্যক্তিগত মানুষের কোনো চিহ্নই বহন করে না। সামাজিক পরিবেশের উপরই ব্যক্তিগত সত্তা নির্ভর করে।

ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিবর্তনের প্রতিচ্ছবি হচ্ছে মানুষ। নৈতিক দর্শন ও আদর্শ আসলে সামাজিক দর্শন ও আদর্শ। সামাজিক প্রয়োজনীয়তার উপরই নৈতিক বাদ-বিচার প্রতিষ্ঠিত এবং সমষ্টিগত মঙ্গলের উপরই সেই নৈতিক আদর্শের বিচার হবে।

নৈতিক দর্শন যখন কোনো প্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থার রক্ষার জন্য সমষ্টির মঙ্গলের বিরুদ্ধে কোনো বিশেষ শ্রেণির স্বার্থ সমর্থন করতে প্রবৃত্ত হয়, তখন নৈতিক দর্শন অবাস্তব গুণের ভ্রান্ত পরমার্থিক আদর্শের আশ্রয় নেয়। অন্যায় সমাজব্যবস্থার সমর্থন এই কাল্পনিক, ঐশ্বরিক নৈতিক আদর্শ দ্বারাই সম্ভব হয়। এই অবিনশ্বর অপরিবর্তনীয় নৈতিক আদর্শই ঈশ্বরবাদের ভিত্তি। আজ যে পৃথিবী এই অবস্থায় উন্নীত হয়েছে তার কারণ বিবর্তনের চাপে এটা অন্যথা হওয়ার উপায় ছিল না। মার্কসবাদ নৈতিকদর্শনের এইসব ভুয়া অবাস্তবতা থেকে উদ্ধার করেছে।

GRONTHO.COM

বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতি

সাধারণত একটা ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান ল্যাবরেটরিতে চর্চা করা হয় এবং দর্শন হিমালয়ের উচ্চ চূড়ায় বসে চিন্তা করা হয়, সুতরাং রাজনীতির মতো নিম্নস্তরের বিষয়ের সাথে তাদের কী সম্বন্ধ? তাই প্রথমত দর্শন ও বিজ্ঞানের সঙ্গে রাজনীতির কি সম্বন্ধ তা আলোচনা করা প্রয়োজন। প্রচলিত ধারণা এই যে, যাদের কোনো কাজ নেই এবং জীবনের কোনো দিকেই কোনো কিছু করতে পারেনি, সেইসব অকর্মণ্য, বেকার লোকদের কাজই হচ্ছে রাজনীতি করা এবং তাই এটা অত্যন্ত নোংরা কাজ। কাজে কাজেই সকলেরই ধারণা রাজনৈতিক ব্যাপারে যত কিছু খারাপ কাজই হয়ে থাকে এবং এ ধারণা শুধু আমাদের দেশেই যে বিদ্যমান তা নয়, অন্যান্য দেশ সম্বন্ধেও এটা অনেকাংশে সত্য। তার একটা কারণ এই যে, রাজনীতি মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট। দুর্ভাগ্যবশত বর্তমান সমাজব্যবস্থা এতই মন্দ যে, তা নিয়ে কারবার কখনোই পবিত্র, উন্নত বা আদর্শস্থানীয় হতে পারে না। সুতরাং রাজনীতি সম্বন্ধে স্বভাবতই লোকের ধারণা খুব বিকৃত রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যেও অনেকের ধারণা নেই যে, রাজনীতি একটা বিজ্ঞান। যদিও এটা একটা স্বাধীন বিজ্ঞান নয় তাহলেও রাজনীতি সমাজ বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞানের সাধারণত স্থির সংজ্ঞা আছে কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের কারবার হলো মানুষ নিয়ে, যা সৃষ্টিজগতের মধ্যে সবচেয়ে অস্থির এবং পরিবর্তনশীল। অধুনা বিজ্ঞানের একটা মৌলিক সিদ্ধান্ত এই যে, অংকের ভাষায় না প্রকাশ করতে পারলে কোনো মতবাদকেই বিজ্ঞানের মর্যাদা দেওয়া যাবে না। যদিও অংকশাস্ত্র অজানা জিনিস নিয়ে গবেষণা করে

তবুও কয়েকটি পরিচিত সংজ্ঞা ছাড়া গণিতশাস্ত্রের কোনো সিদ্ধান্তই সম্ভব নয়। কিন্তু সমাজবিজ্ঞান আজ পর্যন্ত সামাজিক জীবনে মানুষের আচার-ব্যবহারের কোনো পরিচিতি-সংজ্ঞা ঠিক করতে পারেনি। সামাজিক সমস্যা অংকের আকারে প্রকাশ করা যায় না, তাই রাজনীতিকেও বিজ্ঞান বলা যেতে পারে না।

প্রচলিত ধারণা হলেও এটা একমাত্র সত্য নয়। অনেকের মতে সমাজেরও বিজ্ঞান সম্ভব; মানুষের আচার-ব্যবহারের কিছু কিছু নির্দিষ্ট সংজ্ঞা পাওয়া যায়, যা থেকে সামাজিক সমস্যা, মানুষের সামাজিক জীবনের ব্যবহার ইত্যাদির সমস্যা প্রায় অঙ্কের মতোই বিচার করা যাবে। মানুষের সামাজিক জীবনের আচার-ব্যবহারের নিয়মাদি যে বিজ্ঞান ধার্য করে তাই হচ্ছে রাজনীতি। কিছু নির্দিষ্ট সংজ্ঞা বা মানুষের ব্যবহারের কোনো মাপকাঠি না থাকলে সামাজিক জীবনের কোনো সূত্র রচনা করাই সম্ভব নয়। যতদিন রাজনীতিকে বিজ্ঞান থেকে পৃথকভাবে দেখা হবে, ততদিন রাজনীতির মধ্যে যৌক্তিকতা থাকবে না বা তার কোন মূল সিদ্ধান্ত বা সংজ্ঞাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু রাজনীতি আর বিজ্ঞানের মধ্যে সেই পার্থক্য আজ আর নেই। এখন আর মানুষের দৈনন্দিন জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে অপ্রাকৃতিকভাবে বিজ্ঞানের চর্চা সম্ভব নয়, তছাড়া এখন দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যেও যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে এবং রাষ্ট্রদর্শনের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়েছে। তবে এখনও এমন অনেকে আছেন যাঁরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে মেনে নেন না।

সাধারণত এই ধারণা প্রচলিত আছে যে, দর্শন ও বিজ্ঞান দুটি ভিন্ন শাস্ত্র এবং তাদের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ নেই। বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হলো জড়জগৎ আর দর্শনের বিষয়বস্তু পরমার্থিক জগৎ, সুতরাং এদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ বা সম্বন্ধ থাকা শক্ত; যদি এই দুই শাস্ত্রের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ না থাকে–তাহলে আমরা এ কথা বলতে পারি না যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রদর্শন দ্বারাই ধার্য হয়।

আবার অনেকের মতে, রাষ্ট্রীয় সমাজে মানুষের আচার-ব্যবহারের মোটামুটিভাবে কয়েকটি সংজ্ঞা নির্দেশ করা যায়। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে তা কোনো কাজে লাগে না; যেমন গণতন্ত্র। গণতন্ত্রের মতো আজ আর কোনো আদর্শই

এত হেয় নয়। প্রায় একশ বছর ধরে গণতন্ত্রই ছিল রাষ্ট্রদর্শনের মৌলিক আদর্শ; আর আজ তা সর্বত্রই অশ্রদ্ধেয়। এ থেকে মানুষের ধারণা জন্মেছে যে, গণতন্ত্র মাত্রই কাল্পনিক আদর্শ; কোনোদিনই তা বাস্তবে পরিণত হতে পারে না। অবশ্য এটা খুবই যুক্তিসঙ্গত যে সামাজিক জীবনের নিয়ম-কানুন রচনায় প্রত্যেকের অধিকার থাকা উচিত কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেই অধিকার অলৌকিক কল্পনাই থেকে যায়। বস্তুত দেখা যায় যে, সমষ্টিগত জীবনে মানুষ মেষের মতো ব্যবহার করে এবং গড্ডালিকার মতোই একাধিপত্য শাসনের বশীভূত।

মানুষের সামাজিক জীবন থেকে এই যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে তাতে করে মনে হয় যে, রাষ্ট্রদর্শনের সঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কোনো সম্বন্ধ নেই। আদর্শ সমাজের কতকগুলি সুন্দর সুন্দর নিয়ম-কানুন রচনা করা যায় কিন্তু তা সবই অবাস্তব, অপ্রাকৃতিক—বর্তমান সমাজে তা প্রয়োগের কোনো উপায় নেই। মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনীয়, অবিনশ্বর এবং সেজন্যই মানুষের সমাজও এভাবে চিরকাল থাকবে কোনো পরিবর্তন হবে না—এটাই সাধারণ মত। কাজে কাজেই সেসব সিদ্ধান্তগুলি কখনও বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না এবং ধরে নেওয়া হয় যে, রাষ্ট্রদর্শনের ভিত্তিতে সামাজিক জীবন গড়ে তোলা বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্ভবপর নয়।

এই ধারণা দূর করবার জন্য আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শনের সম্বন্ধ কী এই মৌলিক সমস্যার সমাধান করতে হবে এবং জানতে হবে যে, বাস্তব জীবনের সঙ্গে অবাস্তব জীবনের আদর্শের কোনো সম্বন্ধ আছে কিনা। আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতির ইতিহাস এখনকার প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিরই সুবিদিত। এটা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করে যে বিজ্ঞানের উন্নতির দ্বারা এমন পরিস্থিতির সূচনা হবে যাতে করে সাধারণের জীবনধারণের সুখ-সুবিধা অনেক বেড়ে যাবে; কিন্তু জীবনের যে অন্যান্য সমস্যা (সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য ইত্যাদি) যা থেকে দর্শনের উদ্ভব হয়েছে, তা বিজ্ঞান সমাধান করতে পারে না। সুতরাং বিজ্ঞান সৃষ্টির মূল সমস্যাগুলিকে মাত্র ওপর ওপর স্পর্শ করে, তার সমাধান করতে অক্ষম।

তাই প্রথমেই আমাদের এই ভ্রান্তিটি দূর করবার জন্য দেখাতে হবে

যে, যেমন সিদ্ধান্ত ও কার্যসূচির মধ্যে মৌলিক কোনো প্রভেদ নেই তেমনি বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যেও কোনো প্রভেদ নেই। দর্শন যদি অপ্রাকৃতিক স্তর থেকে বাস্তবে নেমে এসে জীবনের সমস্যার সম্মুখীন না হয় তাহলে মানুষের দর্শনের কোনো প্রয়োজন নেই। যদি ব্যবহারিক বিজ্ঞান ও কার্যকলাপের সমস্যাগুলির সঙ্গে দর্শনের কোনো যুক্তিযুক্ত সম্বন্ধ না থাকে তাহলে মানুষের কাছে দর্শন শুধু ভুয়া কল্পনা এবং তা মানুষের কোনো কাজে আসে না।

সাধারণত একটা ভুল ধারণা আছে যে, বিজ্ঞান তো সেদিনের জিনিস। কিন্তু আসলে বিজ্ঞান সৃষ্টির গোড়া থেকেই আছে; এবং তা দর্শন অপেক্ষা প্রাচীনও নয় বা নতুনও নয়। দর্শনের শুরুই বিজ্ঞানের শুরু। বরঞ্চ দর্শনের ইতিহাস সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকলে এটা দেখা যায় যে, বিজ্ঞান দর্শন অপেক্ষাও প্রাচীন। অন্তত বিজ্ঞানের যে প্রচেষ্টা, পদার্থিক ঘটনাবলির কারণ জানার জন্য যে উৎসুক্য (যা থেকেই আধুনিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি) সেই উৎসুক্য দর্শনের চেয়েও আদিম। এই উৎসুক্য থেকেই দর্শনের সৃষ্টি নয় কি? মানুষ শুধু জড়জগৎ নিয়েই ব্যাপৃত থাকে না, সাধারণত এটা ধরে নেওয়া হয় যে, অপ্রাকৃতিক নৈসর্গিক প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করাই মনুষ্য-জন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রাচীন ইতিহাস পুরাতন পুঁথি ও ঘটনাবলির থেকে এবং এখনও যেসব অসভ্য, অনুন্নত সমাজ আছে তার সঙ্গে আধুনিক কালের সভ্য ও উন্নত সমাজের তুলনা করলে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাই যে, আদিম মানুষের মনে তার অস্তিত্বের বাইরে যে কোনো অলৌকিক শক্তি আছে এই ধারণা কোনোদিন আসেনি। ঈশ্বর এবং আত্মার ধারণা আদিম মানুষের চিন্তাশক্তি এবং কল্পনার বাইরে। তাই সে আদিম মানুষ। এই আদিম মানুষই আমাদের পূর্বপুরুষ। যদি ঐশ্বরিক শক্তির উপলব্ধির ইচ্ছাই মনুষ্য জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হয় এবং এই ইচ্ছা যদি আমাদের মধ্যে অমর আত্মা হিসেবে বিরাজ করে তাহলে তার প্রকাশ আদিম মানুষের মধ্যেও পাওয়া যাবে। তা যখন যায় না, তখন ধরে নিতে হবে যে ঈশ্বর জিজ্ঞাসার উৎসুক্য বা প্রচেষ্টা সামাজিক বিবর্তনের কোনো এক সন্ধিক্ষণে মানুষের মনে প্রবেশ করে।

সেক্ষেত্রে আমরা কী করে প্রমাণ করতে পারি যে, আমাদের দেশে এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও দর্শনের আদি এবং মূল সমস্যা—কেন এবং কী

করে এই বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে? ভারতবর্ষ, মিশর, গ্রিস এবং চীন দেশে, অর্থাৎ যে সমস্ত দেশ শিক্ষা ও জ্ঞানে অন্যান্য সব দেশ অপেক্ষা অগ্রদূত এবং উন্নত ছিল সে সব দেশের প্রাচীন ইতিহাস থেকেও আমরা এই পাই যে, সেখানকার বুদ্ধিজীবীরাও এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল। তারাও এই জীবনের পরে কী আছে সে সম্বন্ধে চিন্তা করতো। এসব থেকে এই ধরে নেওয়া হয় যে, মানুষ প্রথম থেকেই অলৌকিক, পরমার্থিক এবং অপ্রাকৃতিক ব্যাপারে অনুসন্ধিৎসু। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে, ভারতীয় সমাজ যেমন কনাদ ও কপিল থেকে শুরু নয়, গ্রিক সমাজও তেমিন থেলস, ডেমোক্রাইটস বা প্লেটো, সক্রেটিসকে নিয়েই শুরু হয়নি। ভারতীয় সমাজে যেমন আদিম অধিবাসীরা ঋগ্‌বেদের ঋষির চেয়ে প্রাচীন–গ্রিসেও সেই রকম ওইসব মহা চিন্তাশীল ব্যক্তিদের আগেও মনুষ্যসমাজ ছিল। তাদের চিন্তাধারা এবং তাদের আধ্যাত্মিক প্রতিভা সম্বন্ধে গবেষণা করলে আমরা দেখতে পাই দর্শনের মূল সমস্যা বলে যেসব জিনিস অধুনা প্রচলিত তা সৃষ্টির শুরু থেকেই ছিল না।

দুর্ভাগ্যবশত, লিখিত পুঁথিপত্র শেষ পর্যন্ত না থাকায়, আমরা সামাজিক বিবর্তনের ইতিহাসের গোড়ার ব্যাপার জানতে পারি না। বৈদিক যুগের পূর্বের ভারতবর্ষের অধিবাসীরা কীভাবে বাস করতো, কী চিন্তা করতো এবং কিইবা তাদের আচার ব্যবহার ছিল সে সম্বন্ধে কোনো লিখিত ইতিহাস নেই। সেই রকম অন্যান্য দেশেরও একই অবস্থা। সুতরাং আদিম মানুষের মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে তার দুটি উপায়; প্রথমত আমরা ইতিহাস থেকেই পাই যে, দর্শনের প্রবর্তকেরা অপ্রাকৃতিক ব্যাপার সম্বন্ধেই চিন্তিত ছিল। কতকগুলি পদার্থিক ঘটনাই মানুষের চিন্তাশক্তিকে সজাগ করে তোলে; সেই সব পদার্থিক ব্যাপারের কারণ জানার জন্য মানুষ উৎসুক হয়ে ওঠে এবং এই উৎসুক্য থেকেই দর্শনের মৌলিক সমস্যার উদ্ভব হয়।

আজকের সভ্য জগতে বাস করে আমরা ভাবতেই পারি না যে, মানুষের জীবনের সঙ্গে রৌদ্র, বৃষ্টি, বন্যা, ঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক ঘটনার কী নিগূঢ় সম্বন্ধ। কিন্তু বর্তমান যুগেও যদি আমরা শহরের বাইরে বনে-জঙ্গলে বা পাহাড়-পর্বতে যাই তাহলে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের কী নিবিড় সম্বন্ধ তা বুঝতে পারবো। সেখানে প্রাকৃতিক ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষো পাবার কিছুই

নেই। আগুনের দরকার হলে হয়তো দিয়াশলাই নাও থাকতে পারে তখন পাথরে-পাথরে ঘষে আমাদের আগুন জ্বালাতে হবে; এবং এই রকম আরো সব প্রাকৃতিক ঘটনার ভীষণ রূপের সম্মুখীন হতে হবে। আজ আমাদের আগুনের দরকার হলে আমরা দিয়াশলাই, গ্যাস বা ইলেকট্রিক থেকে পেতে পারি। আজ আমাদের বনভোজনে গিয়ে পাথরে পাথরে ঘষে আগুন জ্বালাতে আমোদ লাগে, কিন্তু আদিম মানুষের কাছে এটা মজার ব্যাপার ছিল না, এটা তাদের কাছে জীবন-মৃত্যুর মতো ব্যাপার। আদিম মানুষ পাথরে পাথরে ঠুকে আগুন জ্বালতো বই পড়ে শেখেনি। অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে তাকে এটা বার করতে হয়েছিল। যখনই দরকার তখনই আগুন জ্বালাবার সমস্যা তাকে আগুনের স্থায়ী উপায় বের করতে প্রবৃত্ত করে। এই থেকে আগুনের কারণ সম্বন্ধে নানান অনুমানের শুরু হয় এবং এই রকম প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ব্যাপারই আদিম মানুষের অনুসন্ধিৎসু ঐশ্বরিক কল্পনার শেষ হয় আর তার থেকেই অগ্নি-বায়ু প্রভৃতি প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ হিসেবে এক একটি ভগবানের সৃষ্টি হয়।

এইভাবে গবেষণা এবং অনুসন্ধানের শুরু হয়। এই গবেষণা শুধু মূল সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বা শুধু জ্ঞান পিপাসার জন্য আরম্ভ হয়নি–মানুষের প্রয়োজন মেটাবার জন্যই প্রধানত এর শুরু। এবং এই প্রয়োজন পদার্থিক পরিবেশের মধ্যেই নিহিত। অন্য দৃষ্টিভঙ্গিতেও এটা গবেষণা সম্ভব। জীবতত্ত্বের ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা আমরা জীবের সৃষ্টির গোড়ার কথা জানতে পারি। বিভিন্ন জীবের মধ্যে পার্থক্য মোটামুটি দুই রকম: দৈহিক আকৃতির পরিবর্তন এবং ব্যবহারের মধ্যে পরিবর্তন। কীভাবে আকৃতি পরিবর্তন হচ্ছে এবং সেই পরিবর্তন পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির উপর কীভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? জীবনের প্রথম সংকেত পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির সাথে সংঘাত। জড়বস্তুর সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত হয় না, একমাত্র জীবজগতেই তা হয়। তাই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত ঘাত-প্রতিঘাতই জীবনের প্রথম নমুনা।

মানুষ জীবেরই প্রগতির বিকাশ এবং এই নতুন জীব নতুনভাবে পরিবেশের সাথে সংশ্লিষ্ট। এই নতুন ভাব বুদ্ধিজ্ঞাত। অনুন্নত জীবের মধ্যেও বুদ্ধির

পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে বুদ্ধি বা মনই সব থেকে প্রধান। মানুষের বেলায় এই ঘাত-প্রতিঘাত যান্ত্রিকভাবে ঘটে না; মূলত যান্ত্রিক হলেও, জানার ইচ্ছা থেকেই সৃষ্টি। জানার প্রাথমিক প্রচেষ্টাই বিজ্ঞানের শুরু। বিজ্ঞান কথাটার মানেই হলো–জানার ইচ্ছা বা জ্ঞান। পদার্থিক ঘটনাবলির কারণ জানার ঔৎসুক্যই বিজ্ঞানের প্রেরণা, এই বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা ক্রমশ অপ্রাকৃতিকতায় এসে পৌঁছায়। অন্য কোনো রকম প্রাকৃতিক, বৈজ্ঞানিক, সোজা কারণ না পেয়ে আদিম মানুষকে পদার্থিক ঘটনার অলৌকিক ঐশ্বরিক কারণই নির্দেশ করতে হয়। এইসব অনুমানও বৈজ্ঞানিক গবেষণার অবিচ্ছিন্ন অংশ। অনুমান ছাড়া কোনো গবেষণার শুরু হয় না। ক্রমশ অনুসন্ধান ও গবেষণার ফলে হয় অনুমানটি ভুল প্রমাণিত হয়ে তার প্রকৃত কারণ পাওয়া যায়, আর না হয় অনুমানটির স্বপক্ষে বৈজ্ঞানিক কারণ ও যুক্তি পাওয়া যায়! যতদিন যান্ত্রিক বিজ্ঞান এবং মানুষের বুদ্ধি অনুন্নত অবস্থায় থাকে, ততদিন অলৌকিক এবং অপ্রাকৃতিক অনুমান অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু এগুলোকে অনুমান অপেক্ষা বেশি কিছু বলা যায় না।

পদার্থিক ঘটনার আনুমানিক অলৌকিক কারণ নির্ধারণ করার আদিম মানুষের এই প্রচেষ্টা বৈজ্ঞানিক ঔৎসুক্যের পরিচয়। এটার ভিত্তি হলো এই যে, প্রত্যেক ঘটনারই কোনো না কোনো কারণ আছে, শূন্য থেকে কিছুই ঘটতে পারে না।

মানুষের সমস্ত অস্তিত্বই তার পারিপার্শ্বিক পদার্থিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। মানুষ ক্রমশ অনুভব করে যে, এদের উপর অধিকার এবং প্রভাব বিস্তারই মানুষের জীবনের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উপায়। কিন্তু অধিকারের জন্য ক্ষমতা চাই এবং ক্ষমতা নির্ভর করে জ্ঞানের উপর। যেমন: ধরা যেতে পারে বৃষ্টি। বৃষ্টি জমির উর্বরতা আনে এবং তবেই মানুষ তার খাদ্য শস্য জন্মায়। এজন্য সময়মতো বৃষ্টির প্রয়োজন এবং বৃষ্টি না হলে শস্য শুকিয়ে যায়। মানুষ যদি জানতে পারে যে, কী জন্য বৃষ্টি হয় এবং কোন সময়ে হয়, তাহলে ঠিক সেই সময় সে তার জমি চাষ করতে পারে এবং তাহলে তার শস্য শুকিয়ে যাবার আর ভয় থাকে না এবং তাহলে আর সে বৃষ্টির অনুগত হয়ে, অসহায় হয়ে পড়বে না। কী জন্য বৃষ্টি হয় তা যদি মানুষ জানে তাহলে

কখন বৃষ্টি হবে তাও সে জানতে পারবে। এরকম অন্যান্য প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধেও একথা খাটে।

বিবর্তনের প্রথম যুগে, মানুষের জ্ঞান ছিল সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ। তখন প্রাকৃতিক ঘটনার কোনো রকম পার্থিব কারণ নির্ধারণ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু দেখা গেল, প্রত্যেক বছরই একই সময়ে বৃষ্টি পড়ে, নদী সব-সময়ই নিচের দিকে বয়ে যায়, ঠিক সময়ে রাত্রি আসে, প্রতিদিনই ঠিক সময়ে সূর্য ওঠে। মানুষ তার নিজের কার্যকলাপের মধ্যেও এক অদ্ভুত সাদৃশ্য দেখতে পায়। প্রতিদিন সকালে সে ওঠে, রাত্রে শুতে যায়, কিছুক্ষণ অন্তর অন্তর তার খিদে পায়–কিন্তু এসব তাকে জীবতত্ত্বের বিজ্ঞান দিয়ে জানতে হয় না, সহজাত ইচ্ছার সাহায্যেই সে এসব জানতে পারে এবং সেই ইচ্ছার জন্যই সে এসব করে। এই ঘটনাবলির পিছনেও এক ইচ্ছাশক্তি আছে। পৃথিবীতে সমস্ত ঘটনাই নিয়মাধীন। মানুষ এই সব ঘটনার কর্তা নয় এবং হতে পারে না। শক্তিশালী কেউ নিশ্চয়ই এর মূলে আছে, এই ভেবে আদিম মানুষ তার নিজের অনুপাতে ভগবানের সৃষ্টি করে। এইভাবে বৃষ্টির ভগবান, সূর্য দেবতা, বায়ু দেবতা ইত্যাদি এক-একটি ভগবানের সৃষ্টি হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পদার্থিক ঘটনাবলির কারণ জানার ইচ্ছা থেকেই অলৌকিকতা এবং ঈশ্বর-অনুমানের সৃষ্টি। ভালোভাবে বেঁচে থাকার ইচ্ছা থেকেই এই জানার প্রচেষ্টার শুরু। সুতরাং দর্শন আমাদের জীবনযাত্রা এবং জীবনের সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন বা বিজ্ঞান থেকে একেবারে পৃথক কোনো শাস্ত্র নয়। দর্শনও বিজ্ঞান এবং দর্শন কথাটার মানেই হলো জ্ঞানের ইচ্ছা। যাঁরা শিক্ষা গ্রহণ করে, পড়াশুনা করে পৃথিবীর সমস্ত জিনিস জানতে উৎসুক, এবং এই নিয়েই ব্যাপৃত থাকেন তাঁদেরই প্রথম দার্শনিক আখ্যা দেওয়া হয়। তাঁরাই বিজ্ঞানের স্রষ্টা।

আমরা সংস্কৃত পাঁজিপুঁথি থেকে জানতে পারি যে, বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য জড়জগত সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করা এবং দর্শনের উদ্দেশ্য আত্ম বা আধ্যাত্মিক জগতের জ্ঞান অর্জন করা। কিন্তু এই সব Adhoc অনুমান নিষ্প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের অর্থ উচ্চতর জ্ঞান, অর্থাৎ ভুয়া দার্শনিক বা কল্পনামূলক চিন্তাধারা অপেক্ষা প্রত্যক্ষ, সত্য জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। অন্য অর্থে বিজ্ঞান বলতে কোন

বিশেষ বিষয়ে জ্ঞান এবং তাই প্রচলিত অর্থেই এটা দার্শনিক জ্ঞান অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্তরে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনের প্রবর্তক কনাদ ও কপিল, তাঁদের দর্শন কল্পনার উপর ভিত্তি করেননি, জড়জগতের বিশ্লেষণের উপর গড়ে তুলেছিলেন। জড়জগতকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করে তাঁরা তাঁদের বিশ্লেষণ শুরু করেন। জড়জগতের জ্ঞান থেকেই তাঁরা পার্থিব ঘটনার যতকিছুর কারণ অনুসন্ধান করেন। এতে করে বিজ্ঞানকে তাঁরা দর্শনের উচ্চে স্থান দেন; এবং দর্শনকে তাঁরা বিজ্ঞানের ভিত্তিতে গড়ে তোলেন।

দর্শন ও বিজ্ঞানের এই সম্বন্ধ পাশ্চাত্য ইতিহাসে আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। গ্রিক দর্শনের স্রষ্টা থেলাস (Thales) জড়জগতের কারণ অনুসন্ধান ও ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে, পদার্থিক ঘটনার কারণ পদার্থিকই হবে। তিনি জলকেই মূল বা আদি বস্তু হিসেবে ধরেন এবং তাঁর মতে সমস্ত বস্তুর সৃষ্টিই জল থেকে। তাঁর সমসাময়িক হেরাক্লিটাস্ (Heraclitos) সব কিছুর আদি হিসেবে ধরেন অগ্নি। প্রাচীন ভারতের তত্ত্বজ্ঞানী দার্শনিকেরা এবং আদিম বৈজ্ঞানিকেরা সবকিছু পার্থিব ব্যাপারকে 'পঞ্চভূতের' সৃষ্টি বলে ধরেন। পদার্থিক জগতের সম্বন্ধে তৎকালীন অনুসন্ধান ও গবেষণার লিপি হিসেবেই উপনিষদের বৈশিষ্ট্য। অনেকের মতো অগ্নিই হচ্ছে সব কিছুর মূল; অনেকের মতে জল, আবার অনেকে ব্যোম, অনেকে আকাশ ইত্যাদিকে মূল বলে ধরেন। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই শুরুতেই পদার্থিক ব্যাপারের কারণ পদার্থিক বলেই কল্পনা করা হয় এবং পদার্থিক ঘটনাবলিকে এক মৌল পদার্থিকতায় পরিণত করবার চেষ্টা করা হয়।

কিন্তু জ্ঞান অর্জন করার সম্ভাবনা নির্ভর করে তৎকালীন অর্জিত জ্ঞানের উপর। সেই প্রাচীনকালে মানুষের জ্ঞান এত কম ছিল যে, সেই সব আদিম গবেষণার দ্বারা নতুন জ্ঞান অর্জন করা কষ্টসাধ্য ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানার্জনের ঔৎসুক্য মানুষের জীবনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তাই শত বাধা সত্ত্বেও, মানুষের গবেষণা ও অনুসন্ধান চলে আসে, অজানা রহস্যকে উদ্‌ঘাটন করবার প্রচেষ্টা পুরোদমে চলে এটা মানুষের জীবন এবং জীব শক্তি। কোনো না কোনো দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক কারণের প্রয়োজন যাতে করে মানুষ সবকিছু ব্যবস্থা করতে পারে এটাই আনুমানিক তত্ত্বাজ্ঞানজনিত দর্শনের গোড়ার কথা।

গোড়াতে অনুমানের সংখ্যা অনেক বেশি ছিল। আদিম যুগে বহু ভগবানকে কল্পনা করা হতো; পরে প্রশ্ন ওঠে এইসব দেবতা কে সৃষ্টি করে এবং তা থেকে একেশ্বরের প্রচলন হয়। এ থেকে আরও অনেক বিতর্কের পর বহু ধর্মের সৃষ্টি হয়। কেন ভগবান এই নির্দিষ্টভাবে জগতকে পরিচালনা করেন ইত্যাদি প্রশ্ন নিয়ে এক এক ধর্মবিজ্ঞানের (Theology) সৃষ্টি হয়। দেবতাকে যখন জড়জগতের স্রষ্টা হিসেবে কল্পনা করা হলো তখন মানুষের স্বাভাবিক যুক্তির বশেই সে দেবতার বিষয় জানতে উৎসুক। তাই থেকে ঈশ্বরবাদের (Theology) সৃষ্টি।

ক্রমশ ধর্মাত্মক দর্শন বা ঐশ্বরিক বিজ্ঞানের সৃষ্টি ও প্রচলন হয় এবং মানুষ আবার বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করে। এই বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঔৎসুক্য থেকেই মানুষের সামাজিক বা আধ্যাত্মিক জীবনের শুরু। আদিম প্রচেষ্টায় মানুষ বাস্তবিক সংজ্ঞা দিয়ে পদার্থিক ঘটনাবলি সমর্থন না পেয়ে, অনুমানিক কারণের সৃষ্টি করে কিন্তু এই অনুমানও বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ঔৎসুক্যের পরিচায়ক। অভিজ্ঞতার সাহায্যে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধি হয়। মানুষ যেমন করে আগুন জ্বালতে শেখে, সেভাবে প্রত্যেক ঘটনার কারণ এবং যে নিয়মের তারা অনুগত তা জানতে পারে। এবং এই ক্রমোবৃদ্ধিতে জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাবলি পদার্থবিজ্ঞান দ্বারা ব্যাখ্যা করতে পারে। সে জানতে পারে কি জন্য বৃষ্টি হয়, বাতাস কেন বয় ইত্যাদি এবং এর ফলে ঐশ্বরিক কারণ দূরীভূত হয়।

আদিমকালে, অজ্ঞানতা মানুষকে পদার্থিক ঘটনার ঐশ্বরিক কারণ-অনুমান করতে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে এক একটি ঘটনার এক একটি দেবতা তৈরি করতে বাধ্য করে। পরে, জ্ঞান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, মানুষ সেই সব ঘটনা সহজ, সরলভাবে, পদার্থিক নিয়মের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতেও সমর্থ হয় এবং তার আর ভগবান সৃষ্টি করবার প্রয়োজন হয় না। মানুষ নিজেই যেমন ভগবানের স্রষ্টা, মানুষ নিজেই তেমনি তার নিরর্থক অপ্রয়োজনীয় সৃষ্টিকে আবার ধ্বংসও করে, এটাই হলো বিজ্ঞানের সার কথা। আজ যা খুব স্পষ্ট এবং সত্য বলে মনে হচ্ছে তা শুধু আজকের জন্যই। যদি কাল আমরা দেখতে পাই যে, তা সত্য নয়, তার চেয়ে অধিক জ্ঞান আমরা পাই, তাহলে

সেই পুরাতন অনুমানকে অগ্রাহ্য করে, নতুন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার এটাই বিজ্ঞানের সার তথ্য। এক সময়ে নিউটনের কথাই ছিল বিজ্ঞানের শেষ কথা।

বৈজ্ঞানিকদের কাছে তিনি দেব-স্বরূপ ছিলেন। আজ তিনি সেকেলে, অনর্থক হয়ে পড়েছেন। শুধু এই নয়, বিজ্ঞানের বহু প্রাচীন নিয়ম-কানুন, যুক্তি-তর্কই আজ নিরর্থক। জ্ঞানের কোনো সীমা নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, জ্ঞান কখনও সেকেলে বা অকেজো হয়ে পড়ে না। পুরাতন জ্ঞানের ভিত্তিতেই নতুন জ্ঞানের সৃষ্টি হয়। পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর দেহের ব্যবহারিক এবং উপযুক্ত গঠনের মধ্যেই এর শুরু হয় এবং সেই থেকে জ্ঞান বাড়তেই থাকে। দর্শন এবং বিজ্ঞান–এ দুয়েরই এই প্রণালীর সাথে সংশ্লিষ্ট। জ্ঞানার্জনের আধার হলো বিজ্ঞান এবং নতুন জ্ঞানার্জনের জন্য অর্জিত জ্ঞানকে নিয়মাবদ্ধ, শৃঙ্খলাবদ্ধ করার কাজ হলো দর্শনের।

পার্থিব জীবন থেকে পৃথকভাবে জ্ঞান অর্জন করা সম্ভব নয়। সমস্ত জ্ঞানই মানুষের জীবনের এক বিশেষ অংশ। দৈহিক প্রক্রিয়াই হলো জ্ঞানের আধার এবং দৈহিক প্রক্রিয়া যান্ত্রিক ঘাত-প্রতিঘাতের উপরই নির্ভর করে। জ্ঞানার্জনের মধ্যে অলৌকিক, অপ্রাকৃতিক ব্যাপার কিছুই নাই। মস্তিষ্ক দেহের একটি যন্ত্র বিশেষ, আর পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতিও পদার্থক। এর মধ্যে অপ্রাকৃতিক কিছুই নেই, যেমন আয়নায় নিজের চেহারা দেখা।

প্রকৃত জ্ঞানই হলো বিজ্ঞান। যদি জ্ঞান এবং বিজ্ঞানকে পৃথক পৃথকভাবে দেখতে হয়, জ্ঞানকে মানসিক বোধ বা বোধশক্তি হিসেবে ধরা যেতে পারে বোধ-শক্তি জ্ঞানের চেয়ে বড় কখনই নয়। জ্ঞান অর্জন করা শিক্ষা সাপেক্ষ এবং তা বোধশক্তি অপেক্ষা অনেক উচ্চস্তরের। বোধশক্তি তো আদিম জীবের মধ্যেও আছে কিন্তু জ্ঞানার্জনের, সমস্ত ব্যাপারের তথ্য জানার ক্ষমতা একমাত্র মানুষেরই আছে। নিম্নতর জীবদের মধ্যে বোধশক্তি ও বুদ্ধি বহুস্তরে বিভক্ত। এবং জ্ঞান-এই বোধশক্তি ও বুদ্ধির উচ্চতর, প্রকৃষ্টতর রূপ; বোধ-শক্তির ব্যাপক রূপ। বোধশক্তি জীবের এবং জৈবিক অস্তিত্বের বিশেষ অঙ্গ। সুতরাং জ্ঞান যদি শুধুমাত্র বোধশক্তি হয়, তাহলে বিজ্ঞানকে আরও উঁচুতে স্থান দিতে হয়।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে দর্শনের চেয়ে বিজ্ঞান বড়। কিন্তু দর্শনকে

যদি বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সমষ্টি হিসেবে ধরা হয়, তাহলে দর্শনকে আরও উঁচুতে স্থান দেওয়া যায়। প্রাচীন বলেই বিজ্ঞানের চেয়ে জ্ঞান বড় নয়; জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রের গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যে জ্ঞানের সৃষ্টি হয়, তার সমষ্টিগত প্রকাশ হিসেবে জ্ঞান-বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়।

রাজনীতির সঙ্গে এই আলোচনার সম্বন্ধ এই যে, রাজনীতি বা বিপ্লব বলতে সাধারণ লোকে বোঝে মারামারি, কাটাকাটি, অত্যাচার, পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেওয়া। এই সব ভ্রান্ত এবং বীভৎস ধারণা থেকে রাজনীতিকে মুক্ত করতে হবে। তবে রাজনীতি কাজে আসবে।

বিপ্লব বা বিপ্লবী বলতে কী বুঝায়? পৃথিবী যে কোনো অলৌকিক শক্তিদ্বারা পরিচালিত নয় এবং আজ যে অবস্থায় পৃথিবী আছে মানুষ নিজের শক্তিতে তাকে উন্নত এবং নতুন করে গড়ে তুলতে পারে–এই ধারণা যার আছে সেই বিপ্লবী। বিপ্লবী আরও বলে যে, পৃথিবীকে বহুবার নতুন করে গড়া হয়েছে এবং প্রয়োজনের তাগিদেই তা করা হয়। ভারতবর্ষের যেসব লোক আমাদের দেশকে নতুন করে গড়ে তোলবার প্রয়োজন অনুভব করেছে এবং বিশ্বাস করে যে, ভারতের জনসাধারণের সেই শক্তি আছে, তারাই হলো বিপ্লবী। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ব্যতিরেকে কেউই বিপ্লবী হতে পারে না, প্রকৃত বিপ্লবী হতে হলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। বিপ্লবী হতে হলে এই দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন যে মানুষ শুধু জগৎকেই নতুন করে গড়তে পারে তাই নয়, মানুষ ভগবানকেও তৈরি করতে পারে, ধ্বংসও করতে পারে এবং সৃষ্টির শুরু থেকেই তা করে আসছে। মানুষের প্রকৃতিই হচ্ছে ভগবান প্রতিষ্ঠা করা, তাকে পুনশ্চ ধ্বংস করা এবং নতুন দেবতার সৃষ্টি করা।

সমাজের বিবর্তনের সাথে সাথে রাষ্ট্রীয় গঠনে কতগুলি মূল সিদ্ধান্ত রচনা করা হয়। যদি সেই সিদ্ধান্তগুলিকেই আমরা চিরন্তন, অপরিবর্তনীয় বলে মনে করি তাহলে জগৎকে নতুন করে গড়ে তোলার প্রশ্ন ওঠেনা। বিবর্তন-ভীরু লোকেরা বিপ্লবীদের হয় পাগল, না হয় কল্পনাবিলাসী মনে করেন। কিন্তু রাজনৈতিক সূত্রগুলি শুধুই কল্পনামূলক নয়, মানুষের দৈনন্দিন সামাজিক জীবনের অবস্থার উপরই তার ভিত্তি এবং সেই সামাজিক অবস্থার প্রতীক হলো প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থা সুতরাং রাষ্ট্রীয় রীতিনীতির মূলগত ব্যবহারিক

সংজ্ঞা আছে। সামাজিক অবস্থার তো রাষ্ট্রীয় রীতিনীতিও মানুষের জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট; তাই যখনই প্রচলিত সমাজব্যবস্থা অসহ্য হয়ে ওঠে তখনই আমরা তাদের পরিবর্তন করতে প্রবৃত্ত হই। কিন্তু আমাদের যদি এই দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে যে, আমরা তাদের পরিবর্তন করতে পারি–তাহলে আমরা এর প্রয়োজনীয়তাও উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা যদি গোড়াতেই ধরে নিই যে, সমস্ত কিছুই পূর্বপরিকল্পিতভাবে এবং ঐশ্বরিক ইচ্ছা অনুযায়ী ঘটে তাহলে আমরা সেই সামাজিক ব্যবস্থা বা প্রচলিত রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তগুলি পরিবর্তনের কোনো প্রয়াস পাই না। ভগবদ্‌ ভয়ে ভীত লোক কখনও ভগবানের সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার উৎসাহী হতে পারে না। পরিবর্তন করার ইচ্ছা আমাদের তখনই আসতে পারে যখন আমরা জানতে পারি যে, ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি এবং আমরা ইচ্ছানুযায়ী যে কোনো দেবতাকেই তার উচ্চাসন থেকে নামাতে পারি। যখনই আমরা উপলব্ধি করি যে, আজকের জগৎ যা হওয়া উচিত তা নয়, এর আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন, তখনই আমরা তার স্রষ্টা ঈশ্বরকেও অকর্মণ্য, অনুপযুক্ত বলে সরিয়ে দিতে পারি। যখনই আমরা জানতে পারবো যে, ভগবান আমাদেরই সৃষ্টি, তখনই আর আমাদের সেই কালাপাহাড়ি (Iconoclastic) শক্তির প্রতি কোনো ভীতি থাকবে না। এবং এই মানসিক শক্তি আমরা জ্ঞান থেকে লাভ করি, যার দ্বারা আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে, দর্শন বিজ্ঞান থেকে পৃথক, উচ্চতর কোনো শাস্ত্র নয়।

অনেকের ধারণা বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণার দার্শনিক ফলাফলকে বিচার করলেই দেখা যাবে যে, দর্শন ও বিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিনষ্ট হয়ে গেছে। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শুধু ঊনবিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্বেকার বিজ্ঞান নিয়েই আলোচনা করেছি, কারণ আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিকভাব পর্যালোচনা এবং উপলব্ধি করতে হলে–এই আলোচনার প্রয়োজন। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানই আধুনিক বিজ্ঞানের বনেদ।

সাধারণত, বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ধারণা আছে যে, এটা মনেরই কল্পনা; বিজ্ঞান আমাদের বাস্তব জীবনের প্রকৃত জ্ঞান-অর্জনে কোন সাহায্য করে না। তাই ধরে নেওয়া হয় যে, আধুনিক বিজ্ঞানও আমাদের সেই প্রাচীন দর্শনের জায়গায় এনেছে–যে দর্শনে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য এই জগতের মিথ্যা

প্রবঞ্চনা থেকে উদ্ধার করে একমাত্র সত্য–ঈশ্বরে জীবনকে বিলীন করা।

আদিম মানুষের বাস্তব জগত সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসার শেষ পর্যায় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত। এই বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত পরমাণুর কল্পনার প্রতিষ্ঠিত–অর্থাৎ সমস্ত পদার্থিক ব্যাপারের মূলই হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর কণা–পরমাণু। এই পরমাণু সিদ্ধান্ত অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল নয়, তা বিজ্ঞানের প্রথম যুগ থেকেই বিদ্যমান। গ্রিসে ডেমোক্রাইস্ (Democritas) এবং ভারতবর্ষে কনাদ প্রায় একই সময়ে এই সিদ্ধান্ত গঠন করেন। পরবর্তী অন্যান্য বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণ এই মতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন; অবশেষে নিউটন এবং ডালটন আধুনিক বিজ্ঞানের রূপে এই সিদ্ধান্তকে প্রকাশ করেন। এর ফলে পদার্থ বিজ্ঞান দ্রুত উন্নত হতে থাকে এবং একে একে প্রত্যেকটি প্রাকৃতিক ঘটনার কারণ নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়। প্রকৃতির বহু রহস্যই এতে করে উদ্‌ঘাটিত হয়, এবং গত দুশো বৎসরের উন্নতি ও প্রগতি বোধ হয় তার পূর্বেকার যুগ-যুগান্তরের ইতিহাস অপেক্ষা বেশি।

সাম্প্রতিক আরও গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, পরমাণু অচ্ছেদ্য নয়। আরও ক্ষুদ্রতর বস্তুর সমন্বয়েই পরমাণুর সৃষ্টি। যে ক্ষুদ্র বস্তুর সমন্বয়ে পরমাণুর সৃষ্টি তার নাম ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রন হচ্ছে এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঢেউ। এই ঢেউ নিয়ে এক নতুন সমস্যার উদ্ভব হয়, কারণ এর গতি ও আকৃতি আবার একই সময়ে সঠিক নির্ধারণ করা যায় না। এবং এই রহস্যময় গবেষণাই প্রাকৃতিক কারণ নির্ধারণের মূল। বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও অনেক বড় বড় লোকের মনে এই থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার প্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার অশ্রদ্ধা জন্মায় এবং তাঁরাই এক নতুন মতের প্রবর্তক হন। তাঁদের মতে আমাদের জ্ঞানের বেশির ভাগই আমাদের মনের সৃষ্টি এবং তার সঙ্গে বাইরের বাস্তবের কোনো সম্বন্ধ নেই; সুতরাং বিজ্ঞান যে বহির্জগতের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে এই ভ্রান্ত। তাঁরা বলেন: ‘এই যে গাছ, এ লোকের মনের ধারণা, সত্য সত্যই গাছটা আছে কিনা কেউ বলতে পারে না। কারণ গাছ সম্বন্ধে যে ধারণা তা আমাদের মস্তিষ্কে গাছের যে ছবি চোখের মধ্যে দিয়ে প্রতিফলিত হয় তার উপর, কিন্তু এই যে ছবি মস্তিষ্কে প্রতিফলিত হয় তার সঙ্গে দূরে যে

গাছটা আছে তার সঙ্গে প্রকৃত কি সম্বন্ধে তা নির্ধারণ করবার কোন উপায় নেই। তাই এটা যে শুধু মানসিক ধারণার প্রতিচ্ছবি নয় তা তো ঠিক করে বলা যায় না। গাছটাই মূল না তার মানসিক ধারণাটা মূল তা কি করে জানা যাবে।' বস্তুত এটাই জ্ঞান-বিজ্ঞানের মূল সমস্যা। গোড়া থেকেই কি করে জ্ঞান অর্জন হয় এই সমস্যাতেই দর্শন ব্যাপৃত ছিল। প্রথমত, জ্ঞান-বিজ্ঞানই দর্শন নয় এবং এটাই না বুঝতে পারাতে দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সম্বন্ধ নিয়ে যত সমস্যার সৃষ্টি। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক দর্শনে ব্যক্তিগত ভাব ও মনের গুরুত্ব কম নয় এবং তা মনকে অস্বীকারও করে না। বাস্তব ও প্রত্যক্ষ জ্ঞান বলে কোন কিছু নেই। জ্ঞানার্জনের তিনটি উপাদান; বহির্বস্তু, ব্যক্তি এবং মন অর্থাৎ জানার যন্ত্র। মনের সাহায্য ব্যাতিরেকে জ্ঞান সম্ভব নয়। এর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। আধুনিক রহস্যবাদী বৈজ্ঞানিকেরাও তাই বলেন যদিও, তা সকলেই জানে এবং একেই তাঁরা আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক উপসংহার বলে ব্যক্ত করেন এবং ধরে নেন যে, দর্শন বিজ্ঞান অপেক্ষা শ্রেয়। এইসব যুক্তি দেখিয়ে বলা হয় যে আধুনিক বিজ্ঞান বস্তুবাদের বনেদ ভেঙে দিয়েছে। এই মতের শেষ কথা হলো এই যে, পৃথিবী বাস্তব নয় এবং প্রকৃতিক ও পদার্থিক নিয়মাদির দ্বারাও পরিচালিত নয় কিন্তু কোন বৈজ্ঞানিকই এতটা স্বীকার করবে না যদিও এটাই হলো পূর্বোক্ত মতের যৌক্তিক পরিণাম। তাছাড়া যদি এই পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটনের এবং পদার্থিক নিয়মাদি ও প্রগতির কারণ জানার ক্ষমতা মানুষের না থাকে, বা যদি এরকম কোনো নিয়মই না থাকে, তাহলে মানুষ যে জগতকে এবং সমাজব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে পারে—এই বিশ্বাসকে জলাঞ্জলি দিতে হয়।

জগৎ চিরপরিবর্তনশীল এবং মানুষই সেই পরিবর্তনে সর্বপ্রধান অংশগ্রহণ এই দৃঢ় ধারণাই একমাত্র ঐসব ভ্রান্ত-অবাস্তব ধারণা দূর করতে পারে। কারণ ঐ ধারণা অনুযায়ী রাজনীতির কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকে না—সমাজ-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং বিপ্লব বলে কোনো কিছু থাকে না। সুতরাং আমাদের দেখতে হবে যে, আধুনিক বিজ্ঞানের দার্শনিক মতানুযায়ী সমাজ-বিজ্ঞান অসম্ভব হয়ে ওঠে কি না এবং রাজনীতি একমাত্র বদমায়েসি ও পাগলের উপজীবিকা হয়ে দাঁড়ায় কি না। কিন্তু এর স্পষ্ট

উত্তর 'না'। কারণ, আধুনিক বিজ্ঞান-মাত্র এই বলে যে, জানার জন্য মনের প্রয়োজন। কিন্তু এর সঙ্গে সঙ্গে সাধরণত, লোকের মনে কতগুলি ধারণা জন্মে যে, মন বস্তুর থেকে পৃথক, মন ছাড়া জ্ঞান অর্জনের কোনো উপায় নেই, সুতরাং জ্ঞান মনেরই সৃষ্টি এবং বাস্তব জগৎ আমাদের মনের কাল্পনিক প্রতিরূপ, মনের বাহিরে কিছুরই অস্তিত্ব নেই। সুতরাং যার অস্তিত্ব নেই সে সম্বন্ধে চিন্তা করবার প্রয়োজন নেই, এবং করারও কিছু নেই, সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না। কিন্তু এই সরল আদর্শবাদের মধ্যে কতকগুলি প্রশ্ন রয়ে গেছে। যদি কিছুরই অস্তিত্ব না থাকে এবং সবই মনের কল্পনা হয়, তাহলে আর সকলের মনও আমার মনেরই কল্পনা হয়ে দাঁড়ায়, সুতরাং আমার মন ছাড়া আর কিছুরই অস্তিত্ব নেই–কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই–এবং জগতের কল্পনা করবারও কেউ নেই–কিন্তু আধুনিক আদর্শবাদী বা অধ্যাত্মবাদীরা এতদূর পর্যন্ত যেতে রাজি নন যদিও তাঁরা বিজ্ঞানকে অবাস্তব প্রমাণ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু যদি তাঁরা এতদূর না গিয়ে এইটুকু বলতে চান যে, শুধু মনেরই অস্তিত্ব আছে এবং প্রত্যেকেরই মনেরই অস্তিত্ব আছে–তাতেও বিশেষ সুসিধা হবে না। সত্তার নিজস্ব কোনো অস্তিত্ব থাকতে পারে না; আত্মানুভূতির মূলই হলো অপর কোনো সত্তার অস্তিত্ব এবং এই অন্যের অস্তিত্বের উপরই আত্মসত্তা নির্ভর করে। সুতরাং হিন্দুধর্মের নিরাকার চৈতন্য স্বরূপ রহস্যময় ঈশ্বরের অস্তিত্বের অনুভবের জন্যই বাস্তব জগতের সৃষ্টিরও অনুভবের বিশেষ প্রয়োজন। এবং যদি স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্য ও বাস্তব হয় তাহলে সৃষ্টি ও বাস্তবও প্রত্যক্ষ হবে। পৃথিবী যদি বৈজ্ঞানিকদের মানসিক কল্পনা হয় তাহলে বৈজ্ঞানিকদের মনের মতোই পৃথিবীও বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ। ছায়া যদি সত্য হয় তবে তার কায়াও সত্য।

ধরে নেওয়া হলো সমস্তই মনের সৃষ্টি, সংকীর্ণ-শক্তি বিজ্ঞান, মন কী, তা বলতে পারে না। কিন্তু মন যাই হোক, তা মস্তিষ্কের (Brain) সাহায্যেই কাজ করে এবং মস্তিষ্ক যে বাস্তব এবং প্রত্যক্ষ তা কেউই অস্বীকার করবে না। এখানে আবার সেই পুরানো সমস্যার সম্ভব হয়: কীভাবে মস্তিষ্ক পরিচালিত হয়? চিরাচরিত দর্শন তার উত্তর দিতে অপারগ। একমাত্র আধুনিক বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা এর উত্তর দিতে পারি; আধুনিক বিজ্ঞান এ সম্বন্ধে আমাদের

যথেষ্ট জ্ঞান দিয়েছে এবং হয়ত আরও অনেক কিছু অজানা আছে। কিন্তু যা কিছুই আমরা ঠিক জানি না, তাই যে রহস্যপূর্ণ তা অত্যন্ত ভুল ধারণা। পূর্বে এক সময় বিদ্যুৎ কী তাও জানতাম না। তখন তা অত্যন্ত রহস্যময় ঘটনা ছিল এবং হিন্দুরা বিদ্যুৎকে ইন্দ্রদেবের বজ্রের ঝলকানো আলো বলে অভিহিত করত। কিন্তু আজ আমরা জানি যে, তা সত্য নয়। আমাদের জ্ঞান এখনও সীমাবদ্ধ এবং বহু জিনিস আছে যা সম্বন্ধে আমাদের এখনও কোনো জ্ঞান নেই, কিন্তু সেজন্য এটা বলা অত্যন্ত ভুল না বরং অনুচিত হবে যে, আমাদের বর্তমান জ্ঞানও ভ্রান্তিপূর্ণ। এই যে নব-রহস্যবাদ, অজ্ঞানতাকে এই যে দুর্বলের পূজা করা, মানুষের জানার ক্ষমতাকে অস্বীকার করা আর তথাকথিত গাণিতিকদের এই যে গণিতবিদ ঈশ্বর-কল্পনা এই সবের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান যুগ যুগ ধরে দাঁড়িয়ে এসেছে।

হয়তো এখনও আমাদের জ্ঞান খুবই কম–হয়তো পদার্থ জগৎ সম্বন্ধে আমরা এখনও সবিশেষ জানি না, কিন্তু তাতে করে আমাদের জানার উৎসাহ ও প্রচেষ্টা আরো বাড়া উচিত এবং এই প্রচেষ্টাই হলো জীবশক্তি–জীবনের সার। যেদিন থেকে মস্তিষ্কের সৃষ্টি হয়েছে সেদিন থেকেই জানার প্রচেষ্টাও শুরু হয়েছে। এর কোনো শেষ নেই, জ্ঞান ক্রমাগতই বাড়তে থাকবে, হয়ত জ্ঞানের গণ্ডি এখনও খুবই সীমাবদ্ধ–কিন্তু অজানাকে জানার যে বিস্তৃত ভূমি পড়ে আছে–তাই হলো প্রকৃত অসীমের পরিপ্রেক্ষিত–এই অসীম হলো মানবের প্রকৃত আধ্যাত্ম। যেহেতু জানার প্রক্রিয়া বাস্তব মস্তিষ্কের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং মন অজানা অবাস্তব, রহস্যময় কিছু হতে পারে না এবং অবাস্তব জগতের কল্পনাতে প্রতিষ্ঠিতও হতে পারে না।

যদি আধুনিক বিজ্ঞান ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সবজান্তা মনোভাবকে বিনষ্ট করে থাকে তো ভালোই করেছে। আর জানার নেই, সব জানা হয়ে গেছে–এই মনোভাবই মানুষের জীবশক্তিকে ধ্বংস করে–কারণ, এই মনোভাব থেকে মানুষের কাজ করবার ইচ্ছা নষ্ট হয় এবং কর্মক্ষমতাই হলো জীবনের অভিব্যক্তি। আধুনিক বিজ্ঞান মানব-সমাজের আত্মহত্যার আধার নয়, তা মানুষকে নিঃশেষ করতে চায় না।

পরমাণুই ক্ষুদ্রতম বস্তুকণা এটা সত্য। পরমাণু ইলেকট্রন নিয়েই গঠিত

এবং ইলেকট্রনও স্থায়ী নয় কিন্তু সাধারণ বস্তু সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচলিত আছে সে হিসেবে না হলেও ইলেকট্রনও বস্তু; এবং তা না হলে একে পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণা বস্তু করা যেত না। পদার্থ বিজ্ঞানের কাজই হলো রূপ নিরূপণ করা এবং এর মাপকাঠি সবক্ষেত্রেই বাস্তব এবং পদার্থিক সংজ্ঞা বিশিষ্ট। গণিতশাস্ত্রের অজানা অংক যখন কিছুকে ব্যক্ত করে তখনও তা দ্বারা বাস্তব সংজ্ঞাই বোঝায়–পদার্থ বিজ্ঞান যা কিছু নিরূপণ করে বা অংকের দ্বারা ব্যক্ত করে সবই বাস্তব এবং পদার্থিক সংজ্ঞা এবং ইলেকট্রনও তেমন একটি বাস্তব সংজ্ঞা।

পার্থিব জগতের বনেদের গঠন সম্বন্ধে আমাদের ধারণার পরিবর্তন হয়েছে; কিন্তু তাতে করে তার বাস্তবতা লোপ পায়নি। এই নতুন বনেদকেও আমরা আমাদের পদার্থিক মাপকাঠি দিয়ে নিরূপণ করতে পারি, এই নতুন সংজ্ঞা অসম্ভব নয়, এটাই সব থেকে দরকারি কথা।

তাছাড়া কোনো বৈজ্ঞানিকই একথা বলবে না যে, এই জগতের ঘটনাবলি কোনো নিয়মকানুনের বশীভূত নয়। আগে কয়েকটি নিয়ম বা সিদ্ধান্তকে আমরা চূড়ান্ত বলে ধরে নিতাম এখন দেখা যাচ্ছে যে, এসব নিয়ম বা সিদ্ধান্তও অন্য নিয়মদ্বারা চালিত। বিজ্ঞান জগতকে নিয়মানুবর্তী (নিয়ম-তান্ত্রিক) হিসেবেই গণ্য করে, শূন্য থেকে এর উদ্ভব তা বিজ্ঞান মানে না। আধুনিক বিজ্ঞান গবেষণা করে এই জানতে পেরেছে যে, তা জড় বাস্তুর দ্বারা গঠিত নয়, ক্রিয়াশীল, পরিবর্তনীয় ঘটনা নিয়েই এই জগৎ সংগঠিত। জগৎ স্থির নয়, তা পরিবর্তনের প্রতীক।

মানুষের জ্ঞান ক্রমবর্ধমান। এই ক্রমবর্ধমান জ্ঞান সময়ের সাথে সাথে এবং প্রয়োজনের তাগিদে অনেক নিয়ম, সিদ্ধান্ত যা ভ্রান্ত প্রমাণ হয়েছে তাকে বাতিল করে। এভাবে যেমন এক একটি সিদ্ধান্ত বাতিল হয়েছে, তেমনি নতুন নতুন যুক্তিযুক্ত নিয়ম ও সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এটাই হলো বস্তুবাদের ভিত্তি। সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনারই বাস্তব ভিত্তি আছে এবং তা যে নিরূপণযোগ্য এই স্বীকৃতিই হলো বিজ্ঞানের ভিত্তি ও গোড়ার কথা; এটা ব্যতিরেকে কোনো বিজ্ঞান হতে পারে না এবং জ্ঞানার্জনের উপায়ও অসম্ভব হয়ে যায়। আধুনিক বিজ্ঞান বিজ্ঞানের এই বনেদ ভেঙে দেয়নি; আধুনিক বিজ্ঞান শুধু বিজ্ঞান ও

দর্শনের পার্থক্য লোপ করে দিয়েছে। একমাত্র দর্শনের যেসব চিরাচরিত সমস্যা–কাল, স্থান বস্তু এবং কারণকার্য এসবই এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার অন্তর্ভুক্ত এবং বিজ্ঞান এসব সমস্যার সমাধানও করেছে এখন আর এসব সমস্যা নিয়ে কোনো কল্পনার প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞান এই অবস্থার উন্নীত হলে, হয়ে দাঁড়ায় সর্ববিধ জ্ঞানের সমন্বয় এবং মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন নিজেকেও পরিবর্তিত করতে থাকে। আমাদের দেশে যা দর্শন বলে চির-প্রচলিত তার সঙ্গে অবশ্য এই বৈজ্ঞানিক দর্শনের অনেক পার্থক্য। জগতের রহস্যময় অলৌকিক ধারণাকে এখন আর দর্শন বলে অভিহিত করা যায় না।

যা আমরা জানি না তারই একটা রহস্যময় অলৌকিক কারণ অনুমান করা অজ্ঞানতারই লক্ষণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন বৈজ্ঞানিক রেমন্ড বো (Raymond Du Bois) এই নব অধ্যাত্মবাদ সম্বন্ধে বলেন যে, আমরা কিছুই জানি না এবং জানতে সক্ষম নই–এই হলো দর্শনের সারকথা! এবং যেসব আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে, বিজ্ঞান আমাদের এই অবস্থায় নিয়ে এসেছে, তাঁরা তাঁদের দুর্বলতাকেই সমর্থন করেন এবং তাতেই আনন্দ পান। কিন্তু, বিজ্ঞান তা সমর্থন করে না এবং যাঁরা জ্ঞানকেই একমাত্র শক্তি বলে কল্পনা করেন এবং সেই জ্ঞানের সাহায্যে জগতকে নতুন করে গড়ে তুলতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তারা এ কথা মানতে রাজি নন। বিপ্লবী রাজনৈতিক কর্মীদের দর্শন রহস্যবাদ নয়; বৈপ্লবিক রাজনীতির দর্শন হলো বৈজ্ঞানিক দর্শন। একমাত্র এই বৈজ্ঞানিক দর্শনে অনুপ্রাণিত হলে, তবেই রাজনীতি ক্ষমতা লোভী, শঠ, প্রবঞ্চকদের হাত থেকে উদ্ধার পাবে। রাজনীতির সঙ্গে অধ্যাত্মবাদের অনেক পার্থক্য।

আধুনিক রহস্যবাদী এবং তাদের ছাত্রদের রাজনীতিকে এই ভুয়া দার্শনিকভাবে ব্যক্ত করার মধ্যে একটি গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। উদ্দেশ্য হলো এই প্রমাণ করা যে, সামাজিক ব্যবহার কোনো নিয়মাবর্তী নয়, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলোকে মানুষের প্রয়োজনের তাগিদে পরিবর্তন করার প্রয়োজন নেই এবং সর্বোপরি, মধ্যে মধ্যে সামাজিক ব্যবস্থার বিপ্লবের কোনো প্রয়োজন নেই। এ সবেরই মূল হলো এই যে, বিজ্ঞানের আর প্রয়োজন নেই; পদার্থ-জগত কোনো নিয়মের বশীভূত নয় এবং অসংখ্য অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে

যার কারণ বিজ্ঞান কখনও অনুমান করতে পারেনি বা পারবে না। এই বিরাট বিশ্বজগতের মধ্যে সমাজেও ঠিক এই রকম ঘটনা ঘটছে যা নিয়মের বাইরে এবং যার মধ্যে কোনো কারণ পাওয়া যায় না এবং এখানে প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত। এই যে দার্শনিক মত—এটাই হলো ফ্যাসিবাদের ভিত্তি।

অর্থাৎ যাঁরা বিজ্ঞানের ডিগবাজি এবং সঙ্গে সঙ্গে রহস্যময় অধ্যাত্মবাদী দর্শনের উত্থান নিয়ে মাতামাতি করছেন—তাঁরা শুধু বিপ্লবের জাগৃতি শক্তির বিরুদ্ধে এক বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করছেন। পৃথিবীতে একটা বিরাট পরিবর্তনের প্রয়োজন হয়েছে। বিজ্ঞান আজ বহু লোককে এই জ্ঞান ও এই অনুপ্রেরণা দিয়েছে যে মানুষের জগতকে পরিবর্তন করবার ক্ষমতা আছে। সেই অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ পেয়ে, আজ জনসাধারণ, জগতকে নতুন করে গড়ে তোলবার জন্য, মানুষকে ও সমাজকে সুখী ও উন্নত করবার জন্য পৃথিবীতে এক বিরাট দল সৃষ্টি করছে। এই বিপ্লবকে রোধ করার জন্য, প্রতিষ্ঠিত মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থ বজায় রাখার জন্য, মানুষের বিশ্বাসকে বিনষ্ট করতে, আজকের ভুয়া দর্শন এই প্রচার করে যে, মানুষ যন্ত্রবিশেষ, ভাগ্যের দাস, যে অলৌকিক অপ্রাকৃতিক শক্তি মানুষকে ও জগতকে পরিচালিত করছে, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী মানুষকে চলতেই হবে। বিজ্ঞান আজ দর্শনকে এই মিথ্যা-প্রবঞ্চনা থেকে উদ্ধার করেছে। বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না হয়ে দর্শন বহুদিন শাসক শ্রেণির স্বার্থ রক্ষা করে এসেছে, তার উদ্দেশ্য নষ্ট করে এসেছে; আজ আবার দর্শন তার প্রকৃত স্থান ফিরে পেয়েছে।

আজ বিজ্ঞান ও দর্শনের মধ্যে সমস্ত পার্থক্য লোপ পেয়েছে। এখন দার্শনিকদের বিজ্ঞান সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞান থাকার প্রয়োজন। বিজ্ঞানের জ্ঞানকে সন্নিবদ্ধ করে, মানব-সমাজকে সেই জ্ঞানের সাহায্যে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই দর্শনের কাজ। রাজনীতি হলো দৈনন্দিন জীবনের, মানুষের আচার-ব্যবহারের বিজ্ঞান, এবং সেজন্যে রাজনীতির সঙ্গে বিজ্ঞান ও দর্শনের নিগূঢ় সংযোগের প্রয়োজন। কিন্তু রাজনীতির এই দিকটাই এখনও লোকে উপলব্ধি করেনি; তাই আজও রাজনীতি পাগল, বদমায়েস বা ভাগ্যান্বেষী লোকদের একচেটিয়া অধুনা একদল রাজনীতিজ্ঞের উদ্ভব হচ্ছে যাঁরা রাজনীতিকে দর্শন হিসেবে নিয়েছেন এবং যাঁদের প্লেটোর ভাষায় দার্শনিক সম্রাট বলা যেতে পারে; তবে

আমাদের দার্শনিক সম্রাটের প্রয়োজন নেই, আমরা চাই দার্শনিক সামাজিক মানুষ। গণতান্ত্রিক সমাজ ও সামাজিক জীব গড়ে তুলতে হলে আমাদের বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান থাকার প্রয়োজন এবং বিজ্ঞান, দর্শন ও রাজনীতির মধ্যে যে নিগূঢ় অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ তাও অনুভব করা প্রয়োজন। সুতরাং রাজনৈতিক দর্শনের মূল সিদ্ধান্তগুলি ভুয়া-অবাস্তব হয়ে থাকলে চলবে না, মানুষের অভিজ্ঞতার উপরেই তাকে গড়ে তুলতে হবে। অর্জিত অভিজ্ঞতা যেমন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে, সেই রকম পুরাতন সিদ্ধান্তগুলিকেও বাতিল করে নতুন সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। দর্শন যেমন সর্ববিধ বিজ্ঞানের জ্ঞানকে একত্রে সন্নিবদ্ধ করে, সেই রকম রাজনৈতিক দর্শনকে মানুষের সামাজিক জীবনের সমস্ত অর্জিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, পরিবর্তিত করতে হবে। এই কারণেই মার্কস বলেছিলেন যে, রাজনীতির ভিত্তি সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা। সমাজতন্ত্রবাদের ভীতি, সাম্রাজ্যবাদের বিভীষিকা বা মার্কসবাদের বীভৎসতা বলে যা প্রচলিত তা আর কিছুই নয়–সমাজসমস্যা সমাধানের বৈজ্ঞানিক উপায়। এই হলো মার্কসীয় দর্শন–বৈজ্ঞানিক দর্শন–মানুষের জ্ঞানের সমষ্টি–যাতে করে রাজনীতি হয়ে ওঠে উদ্দেশ্যময়, পূর্ণ এবং যা পরার্থপর মহৎ নর-নারীকে রাজনীতিকে কর্মজীবনের অঙ্গীভূত করে নিতে অনুপ্রাণিত করে। বিজ্ঞানসম্মত, জড়জগতের ন্যায় মনুষ্য-জীবনও নিয়মাবদ্ধ এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত করতে হলে রাজনৈতিক সমস্যাগুলিকেও বিজ্ঞানের সমস্যার মতোই দেখতে হবে। যারা বিশ্বাস করে যে প্রয়োজন মতো জগতকে পরিবর্তন করার ও নতুন করে গড়ে তোলার ক্ষমতা মানুষের আছে–মার্কসবাদ তাদের রাজনীতি এবং বৈপ্লবিক আদর্শ ব্যতিরেকে এই সব দার্শনিক রাজনীতিজ্ঞের রাজনীতির প্রতি কোনো আকর্ষণ নেই।

GRONTHO.COM